শাহ আবদুল হান্নান

নারী ও বাস্তবতা

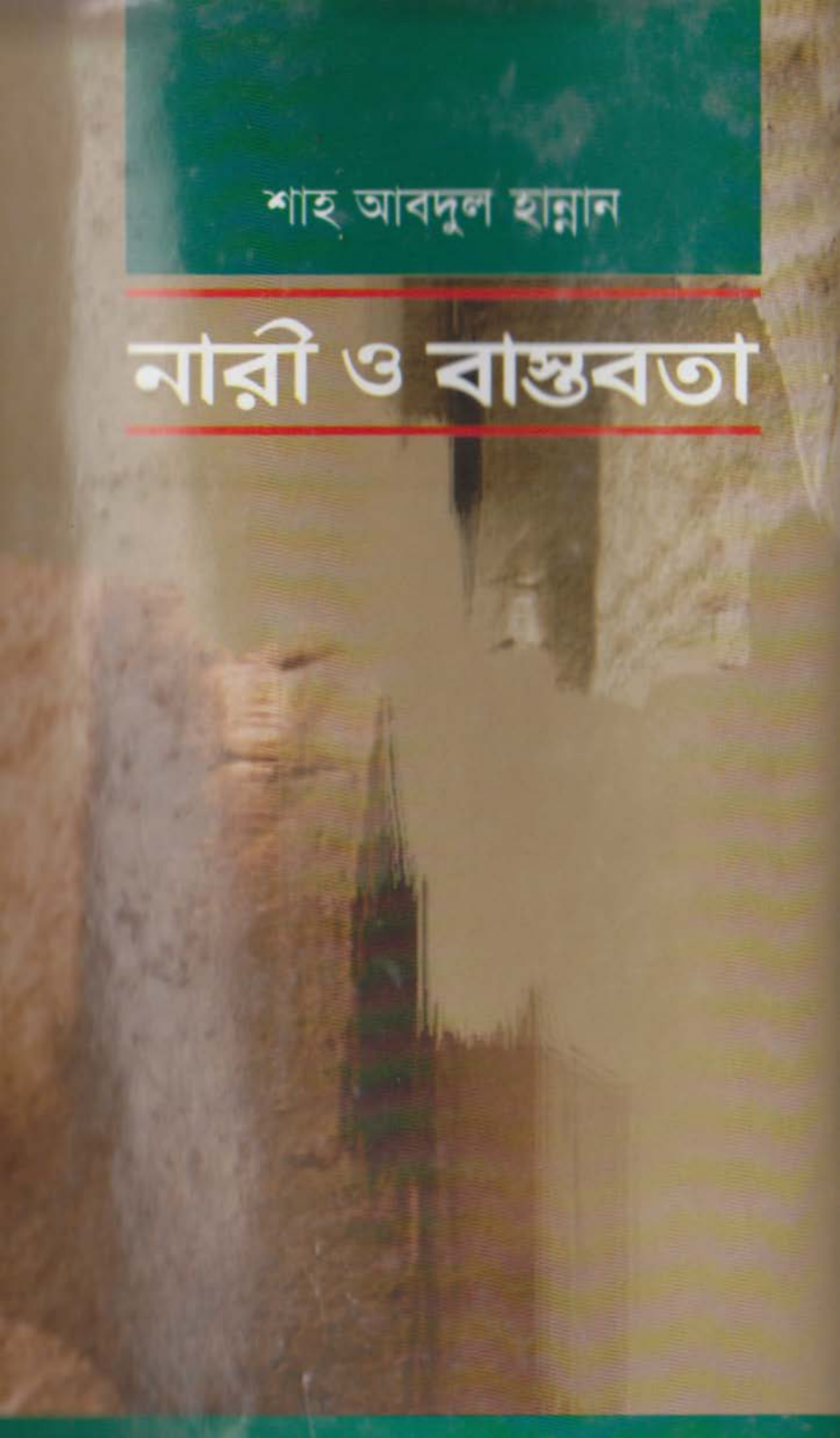

নারী ও বাস্তবতা

শাহ আবদুল হান্নান

এ্যাডর্ন পাবলিকেশন
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

নারী ও বাস্তবতা ❖ শাহ আবদুল হান্নান

প্রথম প্রকাশ ❖ জুলাই ২০০২
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ এ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২৯ সেগুন বাগিচা (পুরাতন ১৪১), ঢাকা-১০০০ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৩০১৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৬০১০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক
প্রচ্ছদ ❖ সুনীল কুমার
মূল্য ❖ একশত টাকা মাত্র

NARI O BASTABATA BY SHAH ABDUL HANNAN

Published in July 2002
Published by Syed Zakir Hossain, Adorn Publication
29 Segun Bagicha (old 141), Dhaka-1000. Tel:9347577, 8313019
e-mail : adorn@bol-online.com
Copyright : Writer
Coverdesign : Sunil Kumar
Price : Tk. 100 Us$ 2

ISBN-984-8193-45-0
Ap-49-2002

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সকল নারীদের প্রতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নারী ও বাস্তবতা

নারী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এ শতাব্দীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ড: সাঈদ রামাদান তার Three major problems confronting The Muslim Ummah পুস্তকে মুসলিম নারীর দুর্দশাকে উম্মাহ্‌র তিনটি সবচেয়ে বড় সমস্যার মধ্যে একটি গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেন যে নতুন যুগে মুসলিমরা নারীকে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত করেছে। রাসূলের যুগে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় তাদের যে অধিকার দেয়া হয়েছিল তা তারা ভোগ করতে পারেনি।

আমি অল্প বয়স থেকে লক্ষ্য করি যে, আমাদের দেশে নারীরা নির্যাতিত ও অবহেলিত। আমার ছোটবেলায় দেখেছি যে নারীরা তাদের শিক্ষার এবং উত্তরাধিকারের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে পারছে না। তখন ইসলামমনা লোকেরা এ ব্যাপারে কোনো ব্যাপক আন্দোলনও করেননি।

ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নারীর প্রশ্নসমূহ সমাজের সামনে চলে এসেছে। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য নেতৃত্ব দিয়েছে, যদিও তাদের পদ্ধতি এবং নারী সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে আমি নৈতিকতা ও মানবাধিকারের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ মনে করি যা আমি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেখায় বলেছি। আমি অবাক হই যে পাশ্চাত্য অবৈধ যৌনমিলনকে মেনে নিয়েছে এবং পতিতাবৃত্তির মতো বিষয়ের ব্যাপারে সত্যিকার অর্থে উদাসীন।

একই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে। একদল ইসলামী চিন্তাবিদ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার জন্য লিখতে এবং আন্দোলন করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ড: ইউসুফ আল কারদাভী (The Status of Women in Islam), আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ (রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা ১-৬ খণ্ড), ড: জামাল বাদাবী (Social System of Islam, Islamic Teaching Course), ড: হাসান তুরাবী, আল্লামা মুহাম্মদ আল-গাজালী, ড: কওকব সিদ্দিকী প্রমুখ। আমি এদেরই ছাত্র।

যেসব বিষয়ে আমি গত চল্লিশ বছর ধরে লিখেছি তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল নারী সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ। নারীর অধিকার সম্বন্ধে, তার শিক্ষা, তার দাবি, তার ক্ষমতায়ন সম্পর্কে যেমন আমি লিখেছি, তেমনি নারী বিষয়ে ইসলামের মৌলিক চিন্তাকে যারা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন বা বিকৃত করেছেন তাদের ভুল, বিভ্রান্তি সম্পর্কেও আমি লিখেছি। আমি মনে করি

www.pathagar.com

ইসলামের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি যে কয়টি বিষয়ের ওপর আগামী শতাব্দীতে নির্ভর করবে তার মধ্যে একটি হবে মানবাধিকার (যার মধ্যে নারীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত) এবং ইসলাম তা কতটা নিশ্চিত করতে পারবে। এ ব্যাপারে গোড়ামিপ্রসূত কোনো অবহেলা বা বাড়াবাড়ি ক্ষতিকর হবে। এ ব্যাপারে ড: ইউসুফ আল কারদাভী তার বই Islmic Awakening between Rejection and Extremism এ আলোচনা করেছেন।

আমার কয়েকজন সুহৃদ আমার নারী সংক্রান্ত লেখাগুলি যা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তা একত্র করে, সংকলন করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ড: আবদুল ওয়াহিদ, কবি ওমর বিশ্বাস। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই পুস্তকে একটি দৈনিকে বিভিন্ন সময় লিখিত বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু চিঠিও প্রয়োজনীয় মনে করেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব 'এ্যাডর্ন' পাবলিকেশন নেয়ায় আমি তার স্বত্বাধিকারী সৈয়দ জাকির হোসাইনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

ইসলামে নারীর মর্যাদা	৯
ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন	১১
ইসলামে কন্যা সন্তানের অধিকার	১৬
ইসলামে নারীর অধিকার : প্রেক্ষিত বেইজিং সম্মেলন	২০
ইসলামে নারী ও লন্ডন ইকোনমিস্ট পত্রিকা	৩০
তসলিমা নাসরিনের একাডেমিক ডিজঅনেস্টি	৩৩
তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা	৩৭
ইসলামে পোশাকের দর্শন ও বিধানাবলী	৪৩
ওড়না পরার নির্দেশ ও কুরআন	৪৬
পতিতা বৃত্তি	৪৮
নারী অপহরণ ও পতিতাবৃত্তি	৬০
পতিতাবৃত্তি কারণ ও সমস্যা	৬৩
পতিতাবৃত্তির সমাধান ঃ একে নিষিদ্ধ করে পুনর্বাসন করতে হবে	৬৬
ধর্ষণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কিছু কথা	৬৮
শহরাঞ্চলের ছিন্নমূল দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন	৭১
মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	৭৪
বর্তমান যুগে নারীর পেশাগত দায়িত্ব পালন	৭৬
সামাজিক কুসংস্কার ও নারী	৭৮
নারী পুরুষের করমর্দন	৮০
নারী পুরুষের পারস্পরিক অধিকারের আলোচনা	৮২
শিশু গ্রহণ আইন	৮৩
নারীর প্রধানমন্ত্রীত্ব	৮৫
ভারতে পাচারকৃত দশ মেয়ের প্রত্যাবর্তন	৮৬
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	৮৭
জাহাঙ্গীরনগর পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনে করণীয়	৮৮
গ্রাম্য বিচারের নামে নির্যাতন	৯০
পতিতাদের পুনর্বাসন	৯১
সরকারি উদ্যোগে পতিতা পুনর্বাসন	৯২
রাশিদার নির্মম হত্যা	৯৩
ঝিনাইদহে মহিলাদের ভোটাধিকার	৯৪
শবমেহের	৯৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীকে যে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মুসলিম দেশ ও সমাজে নারীরা নির্যাতিতা হচ্ছে– সঠিক মর্যাদা পাচ্ছে না।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই নারীদের অযোগ্য ও হীন মনে করা হয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিও নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ।

আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কুরআন পাকের ঘোষণা হচ্ছে, "পুরুষ যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে এবং নারী যেমন কাজ করবে ঠিক তেমনি ফল পাবে" (সূরা নিসা : ৩২ আয়াত)।

"তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করব না– সে আমলকারী পুরুষ হউক বা নারী, তোমরা একজন অন্য জন হতে হয়েছে" (সূরা আল ইমরান, ১৯৫ আয়াত)।

আল্লাহ পাক বনী আদম মাত্রকেই সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "এবং আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি" (বনী ইসরাইল : ৪৭০ আয়াত)। এ সম্মানে নারী পুরুষ সমান অংশীদার। নারী পুরুষ বা মানুষে মানুষে সম্মানের পার্থক্যের কারণ একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহকে মেনে চলা। আল্লাহর ঘোষণা, "হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী লোক হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।" (সূরা হুজরাত : ১৩ আয়াত)।

এ আয়াতের মাধ্যমে চিরকালের মতো মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে কে সম্মানিত তার ভিত্তি বলে দেয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে তাকওয়া। যদি নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হয় তবে সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। পুরুষ হলেই নারী থেকে কেউ অধিক সম্মানিত হয় না। আজকের সারা বিশ্বের কোনো পুরুষের সম্মানই হজরত খাদিজা, হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতেমা (রা. আ.)-এর সমান হবে না।

সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ পুরুষকে নারীর উপর অধিক সম্মানের দাবিদার মনে করেন। আয়াতের অংশটুকু এই, 'পুরুষ স্ত্রীলোকের পরিচালক এই নীতির ভিত্তিতে যে, আল্লাহ তাহাদের মধ্যে কতককে অন্যদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধনসম্পদ (নারীদের জন্য) ব্যয় করে"। আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে এখানে পুরুষকে নারীর উপর বিশিষ্টতা দান করা হয়েছে বলা হয়নি। তদুপরি এ আয়াতের বিশিষ্টতা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখছেন, "এখানে বিশিষ্টতা অর্থ মর্যাদা, সম্মান ও ইজ্জত নহে– যেমন সাধারণ লোকদের ধারণা।

www.pathagar.com

এখানে এ শব্দের অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে এক পক্ষ পুরুষদের আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও শক্তি দান করেছেন যা অপরপক্ষ স্ত্রীদের দেয়া হয়নি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। এ কারণে পারিবারিক ব্যবস্থায় পুরুষ ব্যবস্থাপক হওয়ার যোগ্যতা রাখে" (তাফহীমুল কুরআন : সূরা নিসার ৫৮ নং টিকা)।

নবী করিম (সা.) নারীদের মান মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি নারীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখতেন। মদীনার মসজিদে রাসূলের পিছনে জামায়াতে অনেক মহিলা শরীক হতেন। নামাজের সময় যদি রাসূলুল্লাহ কোনো বাচ্চার কান্না শুনতে পেতেন তাহলে তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং কারণস্বরূপ উল্লেখ করতেন যে, বাচ্চার কান্না নামাজরতা মায়েদের মনে কষ্টের উদ্রেক করে থাকে (বুখারী, হাদীস নং ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭)।

একবার রাসূলুল্লাহর উট চালক আনজাশা আরবী রাখালী গান 'হুদী' গেয়ে উট চালাচ্ছিলেন। উটের উপর মহিলারা ছিলেন। হুদীর তালে তালে উট চলছিল। রাসূলুল্লাহ তখন বললেন, হে আনজাশা আস্তে চালাও, কেননা উটের পিঠের উপর 'কাঁচ' রয়েছে। রাসূলুল্লাহ মহিলাদেরকে কাঁচের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ মহিলাদের দিকে কত খেয়াল রাখতেন। (বুখারী, হাদিস নং ৫৭২১ ও ৫৭০৯)।

অন্য সবাইর মতো মহিলাদের প্রতি সদাচারণ করাও ইসলাম ফরজ করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ নিশ্চয়ই সুবিচার ও সদাচারণ করার জন্য তোমাদের প্রতি আদেশ করেছেন" (সূরা নহল : আয়াত ৯০)।

এ আয়াত নারী পুরুষ মুসলিম অমুসলিম সবার প্রতি সদাচারণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

নারীর অধিকার পুরুষের মতোই। কুরআন বলছে, 'পুরুষদের উপর নারীদের তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন নারীদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের নারীদের উপর একমাত্রা অধিকার বেশি রয়েছে (সূরা বাকারা : ২২৮ আয়াত)।

একথা সত্য যে, সম্পত্তির অধিকার, পরিবারের কর্তৃত্ব এ সব ব্যাপারে সাধারণত পুরুষদের অধিকার বেশি। কিন্তু মোহরানা পাওয়া, তালাকের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের জিম্মা পাওয়া, ভরণপোষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার বেশি। মেয়েদের নামাজ, জিহাদ, হজ্ব ইত্যাদিতে অতিরিক্ত অনেক সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা পুরুষদের নেই। মেয়েদের মসজিদে গিয়ে বা জামায়াতে নামায ফরজ করা হয়নি। জিহাদও পুরুষের মতো তার উপর ফরজ করা হয়নি। হজ্বেও সে পুরুষদের পূর্বে কম ভিড়ে কংকর মারতে পারে। এ সবকিছু বিবেচনা করলে বলা যায় যে, ইসলামে নারী পুরুষের অধিকারের পার্থক্য অতি সামান্য।

ইসলামের দেয়া এ সব অধিকার নারীদের ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ, আলেম ও জনগণের। নারীদের সম্মান বহাল করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন

সমাজে নারীর অবস্থান এবং অধিকার নিয়ে আমরা নানা কথা শুনে থাকি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বর্তমানে যে কথাগুলো বলা হয়, তার মধ্যে অনেকগুলোই গ্রহণযোগ্য। আবার কিছু কিছু কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ আছে। নারী পুরুষ সকলেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া অনস্বীকার্য। কারণ সমাজ দিনে দিনে সামনে এগুচ্ছে। তাই শুধু নারী বা শুধু পুরুষের নয়, বরং সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ অনেকটা এগিয়েছে। এ সময়ে পুরুষের সাথে নারীরাও সমান না হলেও, এগিয়ে এসেছে। বেগম রোকেয়ার সময়ে যে সমাজ ছিল, সে সমাজকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তিনি দেখেছিলেন যে, সে সময়ে মেয়েরা লেখাপড়ার কোনো সুযোগই পেত না। সে সময়ে বেগম রোকেয়া জন্ম না নিলে এবং নারী শিক্ষার ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ না নিলে আজ নারীরা কেউই কিন্তু পড়ালেখা শিখতে পারতো না। অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই তখন অন্য কোনো নারীকে পৃথিবীতে পাঠাতেন যিনি এই কাজটি করতেন। যাই হোক, আমি সেদিকে গেলাম না।

সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে মানুষের উপর; বিশেষ করে নারীর উপর যে অত্যাচার চলছে তার একটা ফাউন্ডেশন আছে, ভিত্তি আছে। অত্যাচারটা আকাশ থেকে আসছে না। নারীর উপরে পুরুষের, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর যে অত্যাচার, তার আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশন'টা (ideological foundation) হলো– সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে, বিশেষ করে পুরুষরা বিশ্বাস করে যে– নারী পুরুষের চেয়ে ছোট, তাদের কোয়ালিটি খারাপ এবং তারা নিচু। এই বিশ্বাস অবশ্য নারীর মধ্যেও কিছুটা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে কতগুলো বিভ্রান্তি থেকে এ বিশ্বাসের জন্ম। আর এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে নারীর প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা এবং নির্যাতন।

এখন আমাদের দেশ থেকে যদি নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হয়, তবে ইসলামকে বাদ দিয়ে তা করা যাবে না। আমি এটা খুব পরিষ্কারভাবে আপনাদের বলতে চাই যে, ইসলামকে বাদ দিয়ে আমাদের মত দেশে (যে দেশে মূলত নব্বই ভাগ মানুষ মুসলিম) চলা যাবে না। যারা ইসলাম থেকে বিদ্রোহ করেছে তারা কিন্তু টিকতে পারেনি, পারছে না। এক মহিলা বিদ্রোহ করেছিলেন– আমি নাম বলবো না তার পরিণতি ভালো হয়নি। খারাপ হয়েছে। আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে, ইসলামের কাঠামোর মধ্যে আমরা যদি এগুতে পারি, তবে তা সব চাইতে ভালো হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামে এরকম একটি ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যা নারীদের সামনে এগিয়ে দিতে পারে।

আমি ইসলামকে বিকৃত করতে চাই না, বিকৃত করার পক্ষেও নই এবং ইসলামের কোনো সাময়িক (Temporary) ব্যাখ্যা দেয়ার পক্ষে নই। সত্যিকার অর্থেই ইসলাম

www.pathagar.com

নারীকে ক্ষমতায়িত করেছে এবং নারীকে সম্মানিত করেছে। নারীকে অধিকার দিয়েছে। সেগুলো ব্যাখ্যা করার আগে আমি 'আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশন'র নতুন ভিত্তি যেটা হতে পারে সেটা বলতে চাই।

কি সেই ভিত্তি? যে ভিত্তির ওপর নারী পুরুষের মৌলিক সাম্য বিদ্যমান? আল্লাহ্ মানুষের চেহারা এক রকম করেন নাই। সকল দিক থেকে, in every dot যেকোনো দু'টি মানুষ সমান নয়। ওজন, উচ্চতা, রঙ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুতে একটি মানুষ থেকে আরেকটি মানুষ আলাদা। কিন্তু মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষ সমান। আল্লাহ্র কাছে সমান। তার চারটি প্রমাণ আমি আপনাদের দিচ্ছি।

১. আল্লাহ্ তায়ালা এ কথা খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহু'। যাকে আমরা 'আত্মা' বলি। মূল মানুষ কিন্তু শরীর নয়। দেহ তো কবরে পচে যাবে। আমরা যারা ইসলামে বিশ্বাস করি তারা জানি, মূল মানুষ হলো 'রুহু'। আল্লাহ্ সকল মানুষকে, তার রুহুকে একত্রে সৃষ্টি করেন, একই রকম করে সৃষ্টি করেন এবং একটিই প্রশ্ন করেন। আল্লাহ্-র প্রশ্নের উত্তরও নারী পুরুষ সকলে একই দিয়েছিল। সূরা আরাফের একটি আয়াত হলো 'ওয়া ইজা আখাজা রাব্বুকা (যখন আল্লাহ্ তায়ালা বের করলেন), 'মিম বানি আদামা (আদমের সন্তানদের থেকে), 'মিন জুহুরিহিম' (তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে) 'জুররিয়াতাহুম' (তাদের সন্তানদেরকে অর্থাৎ সকল আত্মাকে) এবং সাক্ষ্য নিলেন তাদের ওপরে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা সকলে বললো– সকল পুরুষ এবং নারী বললো, 'বালা' (হ্যাঁ), 'সাহেদনা' (আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের প্রভু), (আয়াত নম্বর ১৭২, সূরা আরাফ)।

তার মানে আল্লাহ্র সঙ্গে একটি পয়েন্টে সকল নারী এবং পুরুষের একটি চুক্তি হলো যে, আপনি আমাদের প্রভু, আমরা আপনাকে মেনে চলবো। এক্ষেত্রে পুরুষের চুক্তি আলাদা হয়নি। নারীর চুক্তি আলাদা হয়নি। সুতরাং আমরা দেখলাম, আমাদের ideological foundation এর প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহু' এবং তা সমান। এই সাম্যের পরে যদি কোনো অসাম্য থেকে থাকে তাহলে তা অত্যন্ত নগণ্য, insignificant, very small, তার মানে হচ্ছে, মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এক এবং সে মানুষ হিসেবে এক। এটি হলো নারী পুরুষের সাম্যের প্রথম ভিত্তি।

২. আমরা পুরুষরা গর্ব করি যে, আমাদের শারীরিক গঠন বোধ হয় নারীর তুলনায় ভালো, আল্লাহ্ বোধ হয় আমাদেরকে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন এবং মেয়েরা আনকোয়ালিফায়েড (অযোগ্য)। কিন্তু আল্লাহ্ একটি কথা কুরআনে খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রতিটি মানুষ ফার্স্ট ক্লাস। যারা নামাজ পড়েন, তারা এই আয়াত জানেন; সূরা 'ত্বীন' এ আল্লাহ্ বলেছেন, 'লাকাদ খালাকনাল ইনছানা ফি আহছানি তাকবিম' (নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে, এখানে পুরুষকে বলেন নাই- সর্বোত্তম কাঠামোতে)। তার মানে আমাদের গঠনে পার্থক্য আছে, আমরা এক না, আমরা ভিন্ন কাঠামোর। কিন্তু সবাই ফার্স্ট ক্লাস, স-বা-ই ফার্স্ট ক্লাস।

www.pathagar.com

সুতরাং নারী-পুরুষের মৌলিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, নতুন নারী আন্দোলনের জন্য অথবা নতুন মানব আন্দোলনের জন্য এটা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুরুষদের এ কথা বলা ঠিক না যে, মেয়েদের স্ট্রাকচার খারাপ। আল্লাহ্ তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। যারা মোমেন, যারা বিশ্বাসী– তারা এ কথা বলবেন না। সুতরাং নারী পুরুষের মৌলিক সাম্যের এটা হলো দ্বিতীয় প্রমাণ। মৌলিক এ কারণে বলছি যে, নারী পুরুষের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য বিদ্যমান।

৩. আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, সকল মানুষ এক পরিবারের। আদম এবং হাওয়ার পরিবারের। সূরা নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, "হে মানব জাতি, সেই রবকে তুমি মানো যিনি তোমাদেরকে একটি মূল সত্তা (নফ্স) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুইজন থেকে তিনি অসংখ্য নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন।" তার মানে আমরা এক পরিবারের।

আমরা হচ্ছি বনি আদম। আদমের সন্তান। আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে অন্তত ২০/৩০ বার বলেছেন "ইয়া বনি আদামা" (হে আদমের সন্তানেরা)। বাপ-মা এবং সন্তানেরা মিলে যেমন পরিবার তৈরি হয়, তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি একটি পরিবার। সব পরিবারের ওপরে হলো মানব জাতির পরিবার। তার মানে আমাদের মৌলিক যে সম্মান ও মর্যাদা, তা সমান। ছোটখাটো কারণে আমাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। তবে জাগতিক মর্যাদা আসল মর্যাদা নয়।

আইনের ভাষায় যেমন বলা হয়, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, তেমনি আল্লাহ্র কাছেও সবাই সমান। আল্লাহ্র কাছে সম্মানের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া। আল্লাহ্ বলেন নাই যে, তার কাছে পুরুষ সম্মানিত বা নারী সম্মানিত। আল্লাহ্ বলেছেন, 'ইন্নাআকরামাকুম' (তোমাদের মধ্যে সম্মানিত), 'ইন্দাল্লাহে' (আল্লাহ্র কাছে) 'আতকাকুম' (যে মেনে চলে আল্লাহ্কে)।

আল্লাহর কাছেই যদি মর্যাদার এই ভিত্তি হয়, তাহলে মানুষের পার্থক্যে কি কিছু যায় আসে? আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি তাকওয়া ছাড়া (আল্লাহ্কে কে মানে আর কে মানে না) কোনো পার্থক্য করেন না। অতএব আমরা এক পারিবারের সন্তান, আমাদের মৌলিক মর্যাদা সমান (সুরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)।

কুরআনের সূরা নিসার একটি আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং ভয় পাও সেই আল্লাহকে, বা মান্য করো সেই আল্লাহ্কে যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করে থাক এবং ভয় পাও গর্ভকে বা মা'কে"। আল্লাহ্ বলছেন গর্ভকে ভয় পাও। কুরআন শরীফের এই আয়াতটির তফসিরে সাইয়েদ কুতুব নামে মিশরের একজন বিখ্যাত আলেম লেখেন, এই ভাষা পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে কুরআনের আগে লেখা হয় নাই। আল্লাহ্ 'গর্ভ'কে ভয় করতে বলে মা'কে সম্মান করার কথা বলেছেন, নারী জাতিকে সম্মান করার কথা বলেছেন। সুতরাং আমাদের মৌলিক সামাজিক মর্যাদা এক্ষেত্রেও সমান বলে প্রতীয়মান হলো। এটা আমাদের নতুন আইডিলজিক্যাল ফাউন্ডেশনের তৃতীয় প্রমাণ (সূরা নিসা'র তাফসীর– সাইয়েদ কুতুব)।

৪. আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সময় বলে দিলেন যে, "তোমরা সবাই খলিফা"। তিনি বললেন, "ইন্নি জায়েনুল ফিল আরদে খলিফা"। আল্লাহ্ বলেন নাই যে, তিনি নারী

www.pathagar.com

পাঠাচ্ছেন বা পুরুষ পাঠাচ্ছেন। এমন কি তিনি বলেন নাই যে, তিনি মানুষ পাঠাচ্ছেন; আল্লাহ্ বললেন, তিনি খলিফা পাঠাচ্ছেন। পাঠালেন মানুষ, বললেন খলিফা। মানুষকে তিনি খলিফা নামে অভিহিত করলেন। খলিফা মানে প্রতিনিধি। আমরা পুরো মানব জাতি হচ্ছি আল্লাহ্র প্রতিনিধি। পুরুষ, নারী নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে তাঁর প্রতিনিধি– আল্লাহ্র প্রতিনিধি। তবে এ কথা ঠিক যে, যদি আমরা গুনাহ্ করি, অন্যায় করি, খুন করি, অত্যাচার করি, জুলুম করি, ঈমান হারিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের খলিফার মর্যাদা থাকে না। কিন্তু মূলত আমরা আল্লাহ্ পাকের খলিফা (কুরআন-২:৩০, ৩৫:৩৯)।

এই খলিফার মর্যাদার মধ্যেই রয়েছে সকল ক্ষমতায়ন; যে ক্ষমতায়নের কথা আমরা বলি। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে না। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের কিছু ক্ষমতা লাগবে। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি এই খেলাফতের মধ্যে রয়েছে। শুধু নারী নয়; 'খেলাফত' শব্দের মধ্যে নারী, পুরুষ, গরীব, দুর্বল সকলের ক্ষমতায়নের ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষ মৌলিক সাম্যের এটি হলো চতুর্থ প্রমাণ।

ইসলাম চায় every man, every woman, every person should be empowered (প্রত্যেককে ক্ষমতায়িত করতে)। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি নারীরা বঞ্চিত থেকে থাকে, তবে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। পুরুষরা কোনোদিন বঞ্চিত হলে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। তবে যে বঞ্চিত তার কথা আমাদের আগে ভাবতে হবে, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমানে আমাদের আগে কাজ করতে হবে।

আজকে মেয়েদের আসল কাজ কি তা নিয়ে কথা উঠছে। তারা কি ঘরে বসে থাকবে? এমন প্রশ্ন উঠছে। কোনো মেয়ে যদি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে ঘরে থাকতে চায়, তবে তার সেটা করার অধিকার আছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লাহ্ কোথাও বলেন নাই যে, নারীদের ঘরে বসে থাকতে হবে, বাইরের কাজ নারীরা করতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ মূল দায়িত্ব নারী পুরুষের একই দিয়েছেন। সূরা তওবার ৭১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, নারী পুরুষের দায়িত্ব ৬টি। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : মোমেন পুরুষ এবং মোমেন নারী একে অপরের অভিভাবক (ওয়ালী), একে অপরের বন্ধু, একে অপরের সাহায্যকারী (এই আয়াত কুরআন শরীফের সর্বশেষ সূরাসমূহের একটি। উল্লিখিত বিষয়ে আগে যে সকল আয়াত আছে সেগুলোকে এই আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে)। এই আয়াতে বলা আছে যে, নারী পুরুষ একে অপরের অভিভাবক, গার্জিয়ান, অনেকে বলেন যে, নারী গার্জিয়ান হতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন নারী গার্জিয়ান হতে পারে। কুরআনে এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। নারী পুরুষের নির্ধারিত ৬টি দায়িত্ব হচ্ছে :

ক. তারা ভালো কাজের আদেশ দিবে।

খ. মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করবে।

গ. উভয়ে নামাজ কায়েম করবে।

ঘ. যাকাত দিবে।

www.pathagar.com

ঙ. আল্লাহ্‌কে মানবে।

চ. রাসূলকে মানবে।

এসব কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ নারীদের সকল ভালো কাজে অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এটাই ইসলামের নীতি। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যারা এই ৬টি দায়িত্ব পালন করবে তাদের উপর আল্লাহ্ তায়ালা রহমত করবেন। কুরআনের বেশ কয়েকটি তাফসীর পড়ে এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে পুরোপুরি বিশ্বাসী একজন মানুষ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, এই ছয়টি দায়িত্বের মধ্যে নারী পুরুষ সবাই সমান। রাজনীতি, সমাজসেবা ইত্যাদি সব কাজই এ ৬টির আওতায় পড়ে।

আজ আমরা ইসলামের মূল জিনিস পরিত্যাগ করে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মানুষের তৈরি বিভিন্ন কিতাবের ওপর নির্ভর করছি। আল্লাহ্‌র মূল কিতাবকে আমরা সেই তুলনায় গুরুত্ব দিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। এখানে একটি কথা বলা দরকার, ইসলামকে যদি কেউ অন্যের মাধ্যমে শেখেন তবে তারা কখনো মুক্তি পাবেন না। প্রত্যেককে কুরআনের পাঁচ ছয়টি তাফসীর নিজে পড়তে হবে। অনেকে অনুবাদের মধ্যে তাদের নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে পাঁচ ছয়টি তাফসীর পড়লে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় মানুষের কথা ঢুকেছে; আর আল্লাহ্‌র কথাটা কি? কয়েক রকম ব্যাখ্যা পড়লে আমরা ঠিক করতে পারবো, কোন্ ব্যাখ্যাটা ঠিক। মেয়েদের মধ্যে বড় তাফসীরকারক হয়নি। মেয়ে তাফসীরকারক থাকলে হয়তো gender bias (লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব) হতো না। তবে কুরআন শরীফের কিছু তাফসীর আছে যেগুলো free from gender bias (লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব মুক্ত); যেমন মোহাম্মদ আসাদের "দি ম্যাসেজ অব দি কুরআন"।

www.pathagar.com

ইসলামে কন্যা সন্তানের অধিকার

কন্যা সন্তানের আলোচনার পূর্বে ইসলামে নারী পুরুষের প্রকৃত অবস্থা কি তা তুলে ধরতে চাই। প্রাচীনকালে ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন সুন্নাহ'র সার্বিক আলোকে নারী পুরুষের অবস্থান সমান মনে করতেন। ইমাম আবু জা'ফর তাহাভী রচিত আহলে সুন্নাহ'র আকিদা (বিশ্বাস) গ্রন্থে (যাতে মুসলিম উম্মতের বিশ্বাসের বর্ণনা করা হয়েছে) তিনি ৬৪ নম্বর ধারায় বলেছেন, "সকল বিশ্বাসী মূলত সমান" (ফি আসলিহি সায়ায়ুন)। তাদের মধ্যে পার্থক্য হয় কেবল তাকওয়া, আল্লাহকে মানা এবং রিপুর বিরোধিতার মাধ্যমে (আকিদাতু আহলে সুন্নাহ্, ইমাম তাহাভী, ৬৪ অনুচ্ছেদ)।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ড. ইউসুফ আল কারদাভী তাঁর The Status of Women in Islam এ বলেছেন,

With the advent of Islam, circumstances improved for the woman. The woman's dignity and humanity were restored. Islam confirmed her capacity to carry out Allah's commands, her responsibilities and observation of the commands that lead to heaven. Islam considered the woman as a worthy human being, with a share in humanity equal to that of the man. Both are two branches of a single tree and two children from the same father, Adam and mother, Eve. Their single origin, their general human traits, their responsibility for the observation of religious duties with the consequent reward or punishment, and the unity of their destiny all bear witness to their equality from the Islamic point of view. (Dr. Yousuf Al Qaradawi : The Status of Women in Islam, available in website : www. witness-pioneer.org).

অনুবাদ : ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের পরিস্থিতির উন্নতি হয়। নারীর সম্মান এবং মানবতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর আদেশ, তার দায়িত্ব এবং আল্লাহর আদেশ পালনের ক্ষেত্রে– যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়, নারীর যোগ্যতাকে (Capacity) ইসলাম পুনঃনিশ্চিত (confirm) করে। ইসলাম নারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন (Worthy) মানুষ মনে করে এবং মানবিকতায় তার অংশ পুরুষের মতো সমান মনে করে। তারা দুজন একই বৃক্ষের দুটি শাখা এবং একই পিতা মাতা আদম ও হাওয়ার দুই সন্তান। তারা একই উৎস, তাদের একই ধরনের মানবিক গুণাবলী, ইসলামী বিধানাবলী পালনে তাদের একই ধরনের দায়িত্ব। যার ফলস্বরূপ পুরস্কার বা শাস্তি পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তাদের একই পরিণতি (Destiny) ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সমতা প্রমাণ করে (Bear Witness)।

কাজেই ইসলামের নর ও নারীর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়েই পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি (কুরআন, ২:৩০)। তাদের রুহ্ একই ধরনের (আল আরাফ : ১৭২) এবং তাদের সবার গঠনই সর্বোত্তম (Excellent) (সূরা ত্বীন)। তাদের পার্থক্য খুব সামান্য। তাদের মূল মানবিকতায় কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য তাদের মধ্যে কিছুটা গঠনগত। তাদের দায়িত্ব কর্তব্যেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এসব পার্থক্যে তাদের সম্মানে কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন আল্লাহ সুরা হুজরাতে বলেছেন যে, 'তাকওয়াই হচ্ছে পার্থক্যের সত্যিকার ভিত্তি, অন্য কিছু নয়' (সূরা হুজরাত : ১৩)। ইসলামে নারীর যে মর্যাদা তা অত্যন্ত উচ্চ এবং তাও বাস্তবসম্মতভাবেই অত্যন্ত উপযোগী। নারীর যে অধিকার ও কর্তব্য তা পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের অনুরূপ। যদিও তা অপরিহার্যরূপে বা নিরঙ্কুশভাবে অভিন্ন রূপ নয়। একজন নারী যে স্ত্রী জাতির অন্তর্ভুক্ত তা তার জন্য মোটেও তার মানবীয় পদমর্যাদা বা স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি এবং এর জন্য তার প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ পোষণ কিংবা তার প্রতি কোনো অবিচার করার কোনো যুক্তি বা ভিত্তি নেই। ইসলাম ততটাই নারীকে দিয়েছে যতটা তার প্রয়োজন। এখানে পূর্ণ ভারসাম্যই রক্ষিত হয়েছে। কুরআন শরীফে নারীর পদমর্যাদাকে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে "আর মেয়েদের রয়েছে (পুরুষেদের উপর) তদ্রুপ অধিকার, যেরূপ বিধি মোতাবেক (পুরুষদের রয়েছে) মেয়েদের উপর। অবশ্য মেয়েদের উপর পুরুষদের রয়েছে একধাপ বেশি পদমর্যাদা (যেমন উত্তরাধিকারের কয়েকটি ক্ষেত্রে রয়েছে বাড়তি সুবিধা (২:২২৮)।"

এই পদমর্যাদা পুরুষদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক নয়। কিংবা নারীর উপর স্বেচ্ছাচার চালানোর কোনো প্রাধিকার নয়। এটা শুধু পুরুষের বাড়তি কর্তব্য কর্মের সাথে সঙ্গতি বিধান এবং তার সীমাহীন দায়-দায়িত্বের জন্যে তাকে কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যই করা হয়েছে।

ইসলামে সকল সন্তানকে আল্লাহর দান (Blessing) বলা হয়েছে। যারা কন্যা সন্তানের জন্মে মন খারাপ করে কুরআনে তাদের নিন্দা করা হয়েছে (কুরআন, ১৬ : ৫৮, ৫৯)। এ প্রেক্ষিতে আমরা নবী করিম (সা.) এর দৃষ্টিভঙ্গি যদি দেখি তাহলে দেখবো তিনি সাধারণ মানুষের মনোভাবকে, কন্যা সন্তানের ব্যাপারে তাদের চিন্তা ভাবনাকে আমূল পরিবর্তন করেন। তার কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

"যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানের জন্মে অসুবিধায় পড়লো, সে যদি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে এ মেয়েরা তার জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে (বুখারী, মুসলিম)।"

আবু দাউদ গ্রন্থের একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে জীবন্ত হত্যার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। পুত্র সন্তানের প্রতি কন্যা সন্তানের তুলনায় অধিক গুরুত্বের ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে এবং পুত্র সন্তানদের প্রতি তার তুলনায় অধিক গুরুত্ব না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"

আল কুরআন একটি বিশ্বজনীন, সর্বজনীন ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তার নাজিলের প্রেক্ষাপট। কুরআন তৎকালীন প্রেক্ষাপটকেও বিবেচনা করেছে। সে সময় আরব দেশে নারীর স্থান ভয়াবহ ও অত্যন্ত অমানবিক ছিল। সেখানে নারী ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত। কন্যা সন্তান ছিল অবহেলিত। তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এ প্রেক্ষিতেই সূরা তাকবীরের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল" অর্থাৎ কেন তাদের হত্যা করা হয়েছিল? কি ছিল তাদের অপরাধ? বাস্তবে যদিও তাদের কোনো অপরাধই ছিল না। তারা ছিল ফুলের মতোই নিষ্পাপ। কিন্তু সমাজই তাদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা, আর জীবন্ত হত্যার পথে ঠেলে দেয়। তারা কখনই বুঝতে পারে না তাদের মূল অপরাধ কোথায়। এখানে কুরআনের সূরা তাকবীরের যে ৯ নম্বর আয়াত উল্লেখ করা হলো তারই ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে যে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া আছে তাতে আগে উল্লিখিত হাদীসগুলোর কথাও বলা হয়েছে।

তাই আমরা বলতে পারি, কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে যেখানে অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও প্রমাণিত হাদীসে অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে সে সব ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বা পুত্র কন্যা সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। আর কোনো পার্থক্য করার অর্থই হলো মানব রচিত ভ্রান্তনীতির অনুসরণে পা বাড়ানো। উল্লেখ্য যে, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাতসহ অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লামা জামাল আল বাদাবী তার 'ইসলামের সামাজিক বিধান' বইতে সন্তানের অধিকারকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। জীবনের অধিকার, পিতৃ পরিচয়ের অধিকার ও সযত্নে বেড়ে ওঠার অধিকার। এসব অধিকারে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই (দ্রষ্টব্য: ইসলামের সামাজিক বিধান, প্রকাশক : দি পাইওনিয়ার, ১৪৪ শান্তিনগর, ঢাকা)। কন্যা সন্তানের যে অধিকার তা পুত্র সন্তানের মতোই। তারও থাকা খাওয়া, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার প্রয়োজন। তাকেও সমাজের একই পরিবেশে অন্যান্যের সাথেই বেড়ে উঠতে হয়।

আমরা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই OIC: Declaration on Human Rights in Islam এর দিকে নজর দিতে পারি। সেখানে মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে Article 1(a) বলা হয়েছে, All Human being from one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All man are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities. Without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief,

www.pathagar.com

political affiliation, social status or other consideration. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

অনুবাদ : আদম থেকে উদ্ভূত এবং খোদার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারের সদস্য। জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, নারী পুরুষ, ধর্ম বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক অবস্থান বা অন্য যে কোনো বিবেচনা নির্বিশেষে মূল মানবিক মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে সকল মানুষ সমান। খাঁটি ঈমান ব্যক্তির মধ্যে মানবিক পূর্ণতা এনে দিয়ে এই মর্যাদা বৃদ্ধিকে গ্যারান্টি দেয়।

Article 6(a) এ বলা হয়েছে Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.

অনুবাদ : মর্যাদা এবং তা ভোগ করার অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের দিক থেকেও নারী পুরুষের সমান। নারীর রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা বা পরিচয় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার নিজের নাম ও বংশ পরিচয় বজায় রাখবার অধিকার।

OIC এ ঘোষণা OIC Fiqh Academy-এর বিশ্ব স্বীকৃত আলেমদের সম্মতির ভিত্তিতেই রচনা ও ঘোষণা করে। ইসলাম যেমন সবার অধিকার নিশ্চিত করে তেমনি একজন কন্যা সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই, কন্যা সন্তানের সকল অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সকলের, বিশেষ করে ইসলামী চিন্তাবিদদের কাজ করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আক্বীদায়ে তাহাভী : ইমাম আবু জা'ফর তাহাভী (রা.)

2. The Status of Women in Islam : Dr. Yousuf Al Qaradawi.

3. Islam in Focus : Hammudah Abdalati

৪. তাফহীমুল কুরআন- ১৯ খণ্ড

৫. ইসলামের সামাজিক বিধান, দি পাইওনিয়ার, ১৪৪ শান্তিনগর, ঢাকা।

6. OIC: Declaration on Human Rights in Islam : The message international, September-2000.

www.pathagar.com

ইসলামে নারীর অধিকার : প্রেক্ষিত বেইজিং সম্মেলন

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে "আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নাই, আমরা তাঁর সম্মানিত বান্দা"। এই একটি মাত্র ঘোষণা আমাদেরকে পৃথিবীর সকল কিছুর দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি দিয়েছে, ঘোষণা করেছে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠিত করেছে আমাদের অধিকার। এই ঘোষণা আমাদেরকে সর্বপ্রথমে যে অধিকার প্রদান করেছে তা এই যে, মানুষ সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইবে, এর মাঝে কোনো দ্বিতীয় স্বত্বভোগীর স্থান নাই। এই অধিকার নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। কোনো পুরুষকে যেমন তার স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে কোনোরূপ মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, তেমনি একজন নারীরও কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুরুষের অনুরূপ নারীর আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির প্রতি জোর দিয়েছে এবং তাকে কখনও পাপের প্রসূতি আখ্যায়িত করে হেয় প্রতিপন্ন করেনি বরং কুরআন মজীদে সরাসরি আদম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে অপরাধ করেছেন, কিন্তু ইশারা ইংগিতেও তার স্ত্রী হাওয়াকে দায়ী করা হয়নি (দ্রষ্টব্য : সূরা তোহা, আয়াত)। অনন্তর কুরআন মজিদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :

"পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব" (সূরা নাহল : ৯৭)।

" পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করা হবে" (সূরা মুমিন : ৪০)।

কুরআন মজিদে অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারীর ব্যক্তিসত্তাও আছে, তার আত্মাও আছে। পুরুষের মতো সেও আত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে এবং এজন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট পুরুষের সমতুল্য পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। অতএব ইসলামে নারী পুরুষের সৎকর্মের প্রতিদানের পরিমাণগত কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

এ প্রসংগে আরও একটি কথা বলে দেয়া প্রয়োজন। আজকাল বলা হচ্ছে, বাস্তব জগতে তো আছেই, বেহেশতেও পুরুষের তুলনায় নারীকে কম সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা আছে। যেমন বেহেশতে এক একজন পুরুষকে হুর দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কিন্তু নারীদের জন্য এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

www.pathagar.com

যারা এই অভিযোগ উত্থাপন করেন তারা যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মজীদ অধ্যায়ন করেন তবে অবশ্যই জানতে পারবেন যে, হুর বেহেশতী পুরুষকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি নয়, বরং প্রত্যেক বেহেশতীকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি পুরুষই হোন অথবা নারী। কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে 'হুর' সম্পর্কে উল্লেখ আছে সেগুলো পড়লেই এর সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীকে আল্লাহ তাআলা এত বিপুল পরিমাণ জীবনোপকরণ দান করবেন যে, কোনো বেহেশতীর মনেই বিন্দু পরিমাণ আক্ষেপ থাকবে না। "ঈমানদাররা বেহশতে যা আকাঙ্ক্ষা করবে ও চাবে তাই পাবে"।

কুরআন মজিদে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী, এমনকি স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের ভূষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

"মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু বা সহযোগী। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সূরা তওবা : ৭১)।

"তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের ভূষণ" (সূরা বাকারা : ১৮৭)।

ইসলাম মানব জাতিকে যেসব অধিকার প্রদান করেছে তাতে নারী ও পুরুষ সকলে মূলত সম অংশীদার। আজকের বিশ্ব নারীর যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই তাকে সেইসব অধিকার প্রদান করেছে। ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, সে সময় ইসলাম নারীকে এমন অধিকার কিভাবে প্রদান করল যার প্রতিষ্ঠার জন্য দেড় হাজার বছর পর পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। ইসলাম একই ঘোষণায় নারী ও পুরুষকে মর্যাদায় ও অধিকারে সমান ঘোষণা করেছে :

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন" (সূরা নিসা : ১)।

ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষ যেমন ভালো কাজ করে শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে, একজন নারীও তেমনি উক্ত কাজ করে শ্রদ্ধার পাত্রী হতে পারে। পুরুষ কোনো অপরাধ করলে যেমন তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি নারীকেও একই অপরাধের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে একই অপরাধের জন্য নারী পুরুষ ভেদে শাস্তির মাত্রায় কোনো তারতম্য নেই।

এ প্রসঙ্গে এশিয়া উইকের ২৫ শে আগষ্ট, ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত বেনজীর ভূট্টোর একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখ করছি"

In an age when no country, no system, no community gave women any rights, in a society where the birth of baby girl was regarded as a curse, where women were considered chattel,

www.pathagar.com

Islam treated women as individuals "Believers, men and women are mutual friends. They enjoin what is just and forbid what is evil," says the Quran (12:71). Long age Islam gave women rights that modern nations have conceded grudgingly and only under pressure.

Since the Quran places great emphasis on human dignity and freedom, it is inconceivable that it would tolerate, much less advocate, any form of discrimination based on race, color or gender. In fact because of its protective attitude toward all the downtrodden, the Quran appears to be weighted in many ways in favour of women. In terms of human rights, the Quran makes no distinction between men and women. The only criterion by which a person is to be judged is piety (Taqwa), which means "to desist from wrong doing".

On coming of age, a woman under Islamic law is vested in all the rights which belong to her as an independent human being. She is entitled to a share in the inheritance of her parents. No one, not even her father, can force her to marry against her expressed consent. and a woman does not cease to be an individual after marriage. Muslim marriage is a civil art. Rights of the husband over the person of his wife are restricted by law and do not extend to her property, her dowry or her earnings. The marriage contract is drawn at the behest of the woman and she can add to it such conditions as she deems necessary to safeguard her interestand they are legally binding on the husband.

Islam permits divorce, though it looks on it as a "necessary evil." In the case of a divorce, the wife retains all that the husband had bestowed on her in marriage and is also entitled to alimony. A woman can also seek a separation, though in this case she has to forego the dowry that her husband had conferred on her. ....

For the crimes of adultery and fornication, the same harsh punishment is prescribed for both men and women found guilty. Women enjoy equally the right to education." Education is obligatory on both Muslim men and women, even if they have to go to China to seek it," is a popular saying of the prophet.

www.pathagar.com

In early Islam when the muslims had to migrate, many women left their homes and took the road to Medina alone. They were present on the battlefield looking after the wounded and even took part in the fighting. Among the first martyrs for Islam was a woman, Sumyya....

We, as women leaders, regard it as our religious and political duty to lead the struggle to restore the women's dignity that has been divinely defined for us in the Holy Quran.

নারীর স্বাধীন সত্তা

ইসলামী শরীয়তে পুরুষ যেমন স্বাধীন সত্তা, নারীও তেমন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা। একজন পুরুষ যেমন স্বাধীনভাবে তার প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, সম্পত্তি উপার্জন ও ক্রয়বিক্রয় করতে পারে, তেমনি একজন নারীও স্বাধীনভাবে উক্ত কাজসমূহ করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী বা পিতা মাতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। স্বামীর কর্মের জন্য স্ত্রী, স্ত্রীর কর্মের জন্য স্বামী, পিতা-মাতার কর্মের জন্য সন্তান এবং সন্তানের কর্মের জন্য পিতা-মাতা দায়ী নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবে না" (সূরা আনআম : ১৬৪; বনী ইসরাইল : ১৫; ফাতির : ১৮; যুমার : ৭; নাজম : ৩৮)।

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে" (বুখারী)।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

স্বাধীন সত্তা হিসেবে একজন বালেগা মুসলিম নারী নিজ পছন্দমত যে কোনো মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অভিভাবক তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দিলে তা কার্যকর হবে না। এক যুবতী মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, তার পিতা তাকে তার অসম্মতিতে বিবাহ দিয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে উক্ত বিবাহ ভেঙে দেয়ার এখতিয়ার প্রদান করেন (আবু দাউদ; আরও হাদীসের জন্য দ্রষ্টব্য : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-২৫৬)।

এমনকি কোনো মেয়েকে নাবালেগ অবস্থায় তার অভিভাবক বিবাহ দিলে সে বালেগ হওয়ার পর উক্ত বিবাহ বহাল অথবা বাতিলের এখতিয়ার লাভ করে। এটা ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং সব মাযহাব এই বিষয়ে একমত (দ্রষ্টব্য : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা নং ৩১৬-৩২১)।

দাম্পত্য জীবনে আর্থিক সুবিধা

বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে মোহরের আকারে আর্থিক গ্যারান্টি প্রদানে আইনত বাধ্য। এই আর্থিক গ্যারান্টি না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তার দাম্পত্য কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে। এই অবস্থায় স্বামীর কিছুই করার নেই। এমনকি স্বামী

www.pathagar.com

যদি মোহরের বাইরেও স্ত্রীকে অলংকার, নগদ অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান করে থাকে তবে তা সে কখনও ফেরত নিতে পারে না। স্ত্রীর ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি থাকলে তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার স্বামীর নেই।

তালাক

ইসলামী আইনে অনিবার্য পরিস্থিতিতে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর রয়েছে তালাকে তাফ্‌ফিজের অধিকার, খুলার অধিকার এবং কোর্টের মাধ্যমে পৃথক হওয়ার অধিকার।

সন্তানের অধিকার

সন্তানের অধিকারী পিতা না মাতা? ইসলামী আইনে সন্তানের অধিকার পিতা-মাতা উভয়ের। পিতা-মাতা মারা গেলে সন্তান যেমন উভয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়, তেমনি সন্তান মারা গেলে পিতা-মাতাও তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হয় (দ্রষ্টব্য : সূরা নিসা, আয়াত : ৭ ও ১১)। কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটলে সন্তান একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে। বালেগ হওয়ার পর সে পিতা বা মাতা যার সাথে ইচ্ছা বসবাস করার এখতিয়ার তার রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সন্তান যার কাছেই লালিত পালিত হোক, পিতাকেই তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হয়, মাতার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই (দ্রষ্টব্য : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা নং ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৭)। তাছাড়া সন্তান অবাধে পিতা-মাতার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোনো পক্ষেরই বাধা প্রদানের আইনত অধিকার নেই।

সন্তানের অধিকার লেখাপড়ার অধিকার

লেখাপড়া শেখা ইসলামে একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। নারী পুরুষ সকলের উপর বিদ্যা অর্জন করা ফরজ। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন... পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন" (সূরা আলাক : ১,৩,৪)।

শিক্ষিতরা ও অশিক্ষিতরা কি কখনও সমান হতে পারে" (সূরা যুমার : ৯)।

মহানবী (সা.) বলেন :

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞানান্বেষণ ফরয" (ইব্‌ন মাজা)।

"যার এক বা একাধিক কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাদেরকে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করলে তারা তার জান্নাতে যাওয়ার গ্যারান্টি হবে"।

ইসলামে ফরয ইবাদতসমূহের পর সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে জ্ঞানার্জন। তাই মহানবী (সা.) বলেছেন : দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর"। এখন মুসলিম নারীর ব্যাপক অজ্ঞতার জন্য দায়ী ইসলাম নয় বরং দায়ী মুসলমানদের অধঃপতন। ইসলামী শরীয় ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণতিতেই তাদের এই

www.pathagar.com

পতন এসেছে। তাই শুধু নারীরাই নয়, গোটা মুসলিম সমাজেই অশিক্ষার হার ব্যাপক। অথচ যেখানে হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-র মত সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী পুরুষ সাহাবী রয়েছেন, সেখানে হযরত আয়েশা (রা.)-র মত সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

যুগ যুগ ধরে কোনো সমাজেই নারী সম্পত্তির মালিক হতে পারত না, এমনকি পিতা-মাতা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর মৃতের পুরুষ আত্মীয়গণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হলেও নারী আত্মীয়র তাতে কোনো অধিকার থাকত না। ইসলাম নারীকে সম্পত্তির মালিক এবং নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ" (সূরা নিসা : ৭)।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় কম পায়। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান" (সূরা নিসা : ১১)।

এই যে পার্থক্য করা হয়েছে তা নারী পুরুষের মর্যাদার ভিত্তিতে নয় বরং আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহনের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অন্যথায় মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ মা পুত্রের তুলনায় কম পেত না। অথচ আমরা জানি, মায়ের মর্যাদা পুত্রের মর্যাদার তুলনায় কত উর্ধ্বে। মহানবী (স.) বলেছেন :

"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"(যায়লাঈ)।

উত্তরাধিকারের অংশের সঙ্গে সম্পর্ক দায়িত্বের, সম্মানের নয়। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি যে, ইসলামী সমাজে নারীকে কোনোরূপ আর্থিক দায় বহন করতে হয় না। এমনকি তার নিজের আর্থিক ব্যয়ভারও তাকে বহন করতে হয় না। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতা বা তার অবর্তমানে অন্য কোনো আত্মীয় এবং বিবাহের পর স্বামী নারীর ভরণপোষণ করতে আইনত বাধ্য, সে ধনী হোক অথবা গরীব। স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তার ভরণপোষণের দায় তাকেই বহন করতে হয়, যদি তার নিজস্ব সহায়-সম্পত্তি থাকে। অন্যথায় তার পিতা, তার পুত্র বা তাদের অবর্তমানে অন্য কোনো নিকটাত্মীয় তার ভরণপোষণ করবে। তার ভরণপোষণ ও আশ্রয়দানের মতো কোনো আত্মীয় না থাকলে সেই অবস্থায় কোনো সংস্থা বা সরকার তার দায়িত্ব নেবে। এই বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে কল্যাণকর বিস্তারিত বিধান রয়েছে। তালাকদাতা স্বামীর উপর তার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব চাপানোর জন্য শরীয়ার পরিপন্থী কোনো বিধান প্রণয়নের আদৌ প্রয়োজন নেই। তা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যও মোটেই সম্মানজনক নয়।

www.pathagar.com

নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি

যেকোনো নারী বৈধ পন্থায় পুরুষের মতোই ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারী। তার সম্পদে তার সম্মতি ব্যতীত পিতা, ভাই, স্বামী বা অন্য কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই বিষয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রয়েছে :

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং কারও সম্পদের কিয়দংশ অন্যায়ভাবে ও জ্ঞাতসারে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ কর না" (সূরা বাকারা : ১৮৮; আরও দ্রষ্টব্য : সূরা নিসা : ২৯)।

"আবু দারদা (রা.)-র স্ত্রী ধনবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী ছিলেন দরিদ্র। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার স্বামী একজন গরীব মানুষ। তার সন্তানদের ভরণপোষণে তার কষ্ট হয়। আমি কি আমার যাকাতের অর্থ আমার স্বামীকে দান করতে পারি? মহানবী (সা.) সম্মতিসূচক জবাব দিলেন"। কিন্তু তিনি একথা বললেন না যে, তোমার সম্পত্তিরও মালিক তোমার স্বামী, ইচ্ছা করলে সে তা যথেচ্ছভাবে ভোগ ব্যবহার করতে পারে।

নারীর সাক্ষ্য

ইসলামী আইনে কোনো বিষয়ে নারীর সাক্ষী হওয়ার অধিকার কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তার এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কর্তৃত্ব কারো নেই। ইসলামী আইনে সাক্ষ্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার দ্বারা কোনো ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরাধীর শাস্তি হয়, নিরপরাধী বেকসুর খালাস পায় এবং সহজে বিবাদ মীমাংসিত হয়। তাই কোনো ঘটনায় নারীকে আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদানে তার পিতা ও স্বামী বাধা দিতে পারে না।

তবে ক্ষেত্রবিশেষ কোথাও এককভাবে কেবল নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য সেখানে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কোথাও নারী পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আবার কোথাও নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রের নিষিদ্ধতা কুরআন ও মহানবী (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই কোনো ক্ষেত্রে ঘটনার প্রেক্ষাপট ও নারীর সাক্ষ্যে বিচারক আস্থা স্থাপন করতে পারলে তদনুযায়ী রায় প্রদান বৈধ। নারী সাক্ষ্য সম্পর্কে কুরআনে ৭ স্থানে বলা হয়েছে। তার মধ্যে সূরা নূরের আয়াত ৬-৯ এ নারী পুরুষের সাক্ষ্যকে সমান বলা হয়েছে। অন্য ৫ স্থানে (কুরআন ৪:১৫; ৫:১০৯; ২৪:৪; ২৪:১৩; ও ৬৫:১) সাক্ষী পুরুষ না নারী হবে তার উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য সমানভাবে গণ্য করতে হবে। কেবল ১ স্থানে (কুরআন ২:২৮২) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে ২ জন পুরুষ সাক্ষ্য বা ১ জন পুরুষ ও ২ জন নারীর সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের পন্ডিতগণ বলেন যে, ইসলামের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা বাইরে সাধারণত কম বিচরণ করে থাকেন। তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সাধারণত কম। এ জন্যই ২:২৮২ আয়াতে সতর্কতার জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসায়ীর হাদীস গ্রন্থে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) একজন সাক্ষী ও একজনের কসমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সব হাদীসে সাক্ষীর লিঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি।

(দ্রষ্টব্য : আল্লামা জামাল আল বাদাবী : ইসলামিক টিচিং কোর্স, লন্ডন থেকে প্রকাশিত; আল্লামা হাম্মুদাহ আব্দুল আতি : ইসলাম ইন ফোকাস, নর্থ আমেরিকান ইসলামী ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত; ড. কত্তকব সিদ্দিকী : মুসলিম নারীর সংগ্রাম, সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ঢাকা)।

এসব ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি প্রকৃতপক্ষে কোনো অবিচার করা হয়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্ব লাঘব করা হয়েছে।

নারীর চাকরির অধিকার

ইসলামী আইনে যে কাজ পুরুষের জন্য বৈধ তা নারীর জন্যও বৈধ। নারীর বাইরে কাজ করার বিরুদ্ধে কুরআন বা সুন্নাতে কোনো অকাট্য 'নম' নাই। বরং নারীর বাইরে কাজ করার বহু উদাহরণ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে (দ্রষ্টব্য : ইসলামে নারী মাওলানা আব্দুর রহীম)। ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী (মৃত্যু ৫৮৭ হি:) তাঁর বিখ্যাত আইনগ্রন্থ বাদাইউস সানাই-এ লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে নারী শ্রম বিনিয়োগের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে (৪খ, পৃ: ৪৯৭-৮, উর্দু অনু.)। ক্ষতিপূরণ আইনে বলা হয়েছে যে, কোনো নারী কোনো সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকলে এবং উক্ত বাহিনীর উপর অর্থদণ্ড আরোপিত হলে, নারী কর্মীদের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত থেকেও নারীর চাকরিতে নিয়োগ বৈধ প্রমাণিত হয়। অবশ্য কোনো পরিবারের নারীরা চাকরি করবে কিনা তা সংশ্লিষ্ট পরিবারের যৌথ সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এখানে ইসলাম কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে না।

নেতৃত্ব

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে যে কাজ পুরুষের জন্য বৈধ তা নারীর জন্যও বৈধ। নারীদের ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব সর্বতোভাবেই বৈধ বরং তাই বাঞ্ছনীয়। আমরা হাদীস অধ্যায়ন করলে দেখতে পাই যে, নারীরা সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হতেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কাউকে তাদের আমীর নিয়োগ করতেন। এমনকি তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বতন্ত্র জামায়াতে নামায পড়ারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে একজন নারীই ইমামতি করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) আমরণ মহিলাদের নিয়ে স্বতন্ত্র তারাবিহ নামাযের জামায়াত করতেন।

নারীর উপর পুরুষের এবং পুরুষের উপর নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

"নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে (পুরুষের উপর) যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, তবে নারীদের উপর পুরুষের অধিকার একধাপ বেশি" (সূরা বাকারা : ২২৮)।

www.pathagar.com

সে অধিকার হচ্ছে পরিবার প্রধান হিসেবে স্বামীর অধিকার (সূরা নিসা : ৩৪)।

এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জাতীয় নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার নারীর আছে কি না? এই ব্যাপারে অধিকাংশ আলেমের মত এই যে নারী দেশের রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে না (দ্রষ্টব্য : পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্র)। তবে জরুরি অবস্থায় হতে পারেন যেমন ফাতেমা জিন্নাহকে এক সময় রাষ্ট্রপ্রধান করা নেতৃস্থানীয় আলেমগণ সমর্থন করেছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেছেন : সাবার রানী যেভাবে পরামর্শ পরিষদের সহায়তায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন অনুরূপ ব্যবস্থার অধীনে নারী নেতৃত্ব অনুমোদনযোগ্য। (ডঃ কত্তকব সিদ্দিকী কর্তৃক তার "মুসলিম নারীর সংগ্রাম" পুস্তকে ইমদালুল ফতওয়া হতে উদ্ধৃত)।

অতএব আমরা বলতে পারি আজ পর্যন্ত নারীকে যেসব অধিকার প্রদানের দাবি উত্থাপিত হচ্ছে তার সবগুলোই ইসলাম তাদেরকে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই দিয়ে রেখেছে। আর যেগুলো দেয়নি তা এই কারণ যে, সেগুলো ইসলামী সমাজ কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যেমন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেইজিং সম্মেলনসহ ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোতে নারীর যেসব অধিকারের তালিকা প্রদান করা হয়েছে তার সবগুলোই অনুমোদন করা যায় না নৈতিক কারণে, মানবিক কারণে এবং মানববংশ ও সভ্যতাকে নিষ্কলুষ রাখার প্রয়োজনে। যেমন নারীর শিক্ষা, আর্থিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি ইসলামের পূর্ণ সমর্থন করেছে। কিন্তু পুরুষ বা নারী কারোর জন্য ব্যাভিচার করা, বিবাহবন্ধন ছাড়াই নারী পুরুষের একত্রে বসবাস ও সমকামিতার অধিকার কোনোক্রমেই দেয়া যায় না মানবজাতির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থেই।

পাশ্চাত্যে নারীর অধিকার

পাশ্চাত্যে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে বলে আমাদের সামনে বহু গালগল্প করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তার বিপরীত। পাশ্চাত্য নারীকে কেবল নগ্নই করেনি তাকে প্রধানত এমন সব কাজ দিয়েছে যা হয় পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য অথবা মূলত কম গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আজ নারী পুরুষের ভোগের পণ্যে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ তার সন্তানদের বোঝা স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিয়ে আরেকটি নারীর পেছনে লাগে। আবার নারীটিও অনেক ক্ষেত্রে বসে নেই সেও সন্তানগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে ছুটে বেড়ায়।

ইসলাম কি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়

কিছু লোক বলে যে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে সর্বপ্রধান বাধা হচ্ছে ধর্ম। তবে ইসলাম সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, চৌদ্দশত বছর আগেই ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়ে রেখেছে, আজকের বিশ্বও তাদেরকে তা দিতে সক্ষম হয়নি। আমরা এই দেশে যে পাশ্চাত্য আইনের অনুশীলন করি তার নব্বই ভাগ গ্রহণ করা হয়েছে ইসলামী আইন থেকে এবং দশ ভাগ নেয়া হয়েছে রোমান আইন থেকে (দ্রষ্টব্য : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

www.pathagar.com

অতএব ধার্মিক ব্যক্তি হয় শান্তিবাদী, শান্তিকামী। বাংলাদেশে গত এক বছরে যতগুলো নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তার ৯৯ ভাগ ঘটেছে অধার্মিক লোকদের দ্বারা। যে কোনো ধর্মের ধার্মিক ব্যক্তিকে কচিৎই এর সাথে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বাস্তবিকই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। বিকল্প পথ অনুসরণ করলে সে বরং অধিকার বঞ্চিতই হবে (দ্রষ্টব্য : আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুককাহ্ এর "রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা", ১ম ও ৩য় খণ্ড; আই আই টি ও ইফসু কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত)।

ধর্ম মানুষের মাঝে যে নি:স্বার্থপরতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদানের যে মানসিকতা সৃষ্টি করে তা অন্য কোনো মাধ্যমে সম্ভব নয়। এদেশের নারীরা যে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে তা ধর্মের কারণে নয় বরং ধর্ম থেকে আমাদের বিচ্যুতির কারণে। আমাদের মধ্যে সৃষ্ট স্বার্থপরতা নীতিহীনতা ও ভোগ স্পৃহায় এর জন্য দায়ী। আসুন আমরা নারীদেরকে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করি। এ সব অধিকার নারীরা প্রকৃতপক্ষে ভোগ করতে পারছে না।

www.pathagar.com

ইসলামে নারী ও লন্ডন ইকোনমিস্ট পত্রিকা

নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করেছে। এই অভিযোগ লন্ডন ইকোনমিস্ট পত্রিকাও করেছে। বলেছে, নারী সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য করেছে। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ নিবন্ধে।

ইকোনমিস্ট পত্রিকা যে তিনটি ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে প্রশ্ন করতে বলেছে এবং তাদের অবস্থানকে পুন:পরীক্ষা করতে বলেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে নারীদের অধিকার। নারীদের অধিকার ইসলাম কি দিয়েছে এ সম্পর্কে ইকোনমিস্ট তাদের ১৯৯৪ সালের ৬ই আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে নারী সম্পত্তির অধিকার অর্ধেক ও তাদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক হওয়ার প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে সূরা নিসা'র ৩৪ নং আয়াতের আলোচনা করে দেখিয়েছে যে, নারীকে মারার অধিকার ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে। নারী মুক্তির জন্য নারীকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বাইরে কাজ করতে হবে- এ পরামর্শ 'ইকোনমিস্ট' দিয়েছে।

ওলামাদের ভূমিকা আলোচনা করে তাদের ভূমিকা খাটো করে আনার পরামর্শও পত্রিকাটি দিয়েছে। ইসলামের নারীর ধর্মীয় অধিকার সমান। তাদের নামাজ, রোজা ও ইসলাম পালনের অধিকার সমান। এমনকি তাদেরকে কিছু কিছু বিষয়ে সুবিধাও দেয়া হয়েছে। যেমন, তাদের নামাজের জামাতে ও জুমাতে শরীক হওয়া ফরজ নয়, তাদের কিছু নামাজ মাফ ও কিছু রোজা তারা বিলম্বিত করে পরে আদায় করে নিতে পারে। ইসলামে নারী পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার মূলত এক। তাদের মৌলিক অধিকারও এক। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকারে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, ব্যবহার, বিনিময়, বিক্রি ও দানের অধিকারে পুরুষ নারী এক। তারা একইভাবে চুক্তি করতে পারে। তারা সমানভাবে ভোটাধিকার প্রাপ্ত, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারী। তাদের শিক্ষার অধিকারও সমান। কুরআন ও সুন্নায় এমন একটি সুস্পষ্ট বাণী নেই যাতে তাদের ঘরের বাইরে কাজ করার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তারা প্রয়োজনে বাইরে জীবিকার জন্য যে কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে। তারা স্বাধীনভাবে বিবাহ করতে পারে এবং প্রয়োজনে তারা তালাকও দিতে পারে। পুরুষ ও নারী তালাকের নিয়ম-নীতিতে (PROCEDURE) কিছু পার্থক্য থাকলেও তালাকের অধিকার নারী পুরুষ সবার আছে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নারী পুরুষ সমান। তারা একই মা ও বাবা বিবি হাওয়া ও আদম (আ.)-এর সন্তান (কুরআন ৪:১)। এদিক দিয়ে তারা সমান। তাদের সবার মধ্যে আল্লাহর দেয়া একই

www.pathagar.com

রুহ রয়েছে (কুরআন ৩২:৯, ১৫:২৯)। তাদেরকে একই আধ্যাত্মিকতা দান করেছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের মর্যাদা মূলত এক (সূরা হুজুরাত, ১৩ আয়াত)। মোহরানা পাওয়া, ভরণপোষণ পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার পুরুষ থেকে বেশি।

নারী পুরুষ একই জান্নাত পাবে (কুরআন ৪০:৪০, ৪:১২৪)। তাদের আমলের মর্যাদা সমান (কুরআন ৩:১৯৪)। নারী পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য শাস্তির আইন এক। কুরআন বা সুন্নাহতে শাস্তি প্রদানের বেলায় নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে আমরা 'ইকোনমিস্টের' কথাগুলো আলোচনা করব। ইকোনমিস্ট সূরা নিসা'র ৩৪ নং আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের পূর্ণ ও যথাযথ অনুবাদ দেয়নি।

ইকোনমিস্টের অনুবাদ হচ্ছে– Men have authority over woman and that if woman cause trouble they should be beaten.

এটি উক্ত আয়াতের পূর্ণ অনুবাদ নয় এবং যথার্থ অনুবাদও নয়। আমি বিভিন্ন তাফসীর থেকে এর অনুবাদ দিতে পারতাম। আমি কেবল একটি ইংরেজি তাফসীর থেকে তার ইংরেজি অনুবাদ ও পরে বঙ্গানুবাদ দেব। আল্লামা ইউসুফ আলীর তাফসীর ইউরোপে সুবিখ্যাত। তিনি তাতে তার অনুবাদ করেছেন :

Men are protector and maintainers of woman... as to those woman on whose part you fear disloyalty and ill-conduct, advorish them (first) next refuse to share their beds (and last) beat them (lightly).

বঙ্গানুবাদ : পুরুষ, নারীর সংরক্ষণ ও ভরণপোষণকারী ... এ সকল নারী যাদের সম্পর্কে তোমরা অবাধ্যতা ও খারাপ আচরণের ভয় কর (প্রথমে) তাদেরকে বোঝা ও (অত:পর) তাদের থেকে বিছানা পৃথক কর এবং (সর্বশেষ) তাদেরকে মার (হালকাভাবে)। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড: আবদুল হামিদ আবু সুলেমান এবং আরো কিছু লেখকের মতে তৃতীয় পন্থাটি হচ্ছে beat বা মারা নয় আলাদাভাবে থাকা (live Seperately). ইকোনমিস্ট তার অনুবাদ ক্ষেত্রে (প্রথমে) তাদেরকে বোঝাও এবং (অতঃপর) তাদের থেকে বিছানা আলাদ কর গায়েব করে দিয়েছে! এটা কেমন সততা! কুরআনে এ বিধান নারীর প্রতি এক ব্যতিক্রমী নির্দেশ যা কেবল তালাক-পূর্ব পরিস্থিতিতে নারীর সাংঘাতিক অসৎ আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (দ্রষ্টব্য : ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও তার সংক্ষিপ্ত টীকা)। উল্লেখ্য পরবর্তী ৩৫ আয়াতে তালাকের আলোচনা এসেছে। স্ত্রী ও নারীর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিধান নিম্নরূপ :

ক. আর স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, সৎভাবে জীবনযাপন কর (সূরা নিসা ১৯ আয়াত)

খ. নারীর প্রতি সদাচরণ কর (বুখারী ও মুসলিম)

গ. যার চরিত্র ব্যবহার উত্তম সেই পূর্ণ ঈমানদার, আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো (তিরমিজি)।

এছাড়া স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি রাসূলের আচরণের কথা আমরা জানি এবং তাই হচ্ছে সুন্নাত বা রাসূলের শিক্ষা যা অনুসরণে মুসলিমরা নির্দেশিত।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, নারীর সবচেয়ে বড় বস্তুগত অধিকার হচ্ছে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার এবং সবচেয়ে বড় অবস্তুগত (Non-Material) অধিকার হচ্ছে সদাচরণ। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে নারী নির্যাতন যতটা সম্ভব প্রতিরোধ কর। আল্লাহপাকই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, অধিকতর শক্তিশালী হিসেবে পুরুষ পরিবারে অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নারীকে কষ্ট দিতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম সূরা নিসা'র ৩৪ নং আয়াতের বিধান দিয়েছেন যে নারীকে বোঝাতে হবে বা তার থেকে সাময়িকভাবে আলাদা থাকতে হবে এবং পরিবার রক্ষার সর্বশেষ পদ্ধতি হিসেবে তাকে হালকাভাবে শাসন করা যায়। কিন্তু রাসূল (সা.) সর্বশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি এবং সর্বশেষ পর্যায়ে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ'র দাসীদেরকে তোমরা মারধর করবে না (আবু দাউদ)। ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার মোটেই কম নয়। যদি নারীর ইসলামে পুরুষ থেকে ভরণপোষণের অধিকার এ বিষয়টি বিবেচনা করা হয় তাহলে আল্লাহর বিধানের যুক্তিযুক্ততা বোঝা যাবে।

নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কে কুরআনে সাত জায়গায় বলা হয়েছে। তার মধ্যে সূরা নূরের আয়াত ৬ থেকে ৯-এ নারী পুরুষের সাক্ষ্যকে সমান বলা হয়েছে। অন্য ৫ জায়গায় (কুরআন ৪:১৫, ৫:১০৯, ২৪:৪, ২৪:১৩ ও ৬৫:১) সাক্ষী পুরুষ না নারী হবে তার উল্লেখ করা হয়নি।

সুতরাং তাদের সাক্ষ্য সমানভাবে গণ্য করতে হবে। কেবল এক জায়গায় (কুরআন ২:২৮২) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে ২ জন পুরুষ সাক্ষ্য বা ১ জন পুরুষ ও ২ জন নারীর সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের পন্ডিতগণ বলেন যে, ইসলামের সামাজিক প্রেক্ষাপটে (Social Framework) নারীরা বাইরে সাধারণত কম বিচরণ করে থাকেন। তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সাধারণত কম। এ জন্য ২:২৮২ আয়াতে সতর্কতার জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে।

এছাড়াও মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসায়ীর হাদিস গ্রন্থে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) একজন সাক্ষী ও একজনের কসমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসব হাদীসে সাক্ষীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি (দ্রষ্টব্য : ডঃ জামাল আল বাদাবী– ইসলামিক টিচিং ক্যাসেট সিরিজ)।

এসব ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি প্রকৃতপক্ষে কোনো অবিচার করা হয়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্ব লাঘব করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নারীর বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে কুরআন বা সুন্নাহ'র কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সর্বশেষ ওলামাদের বিরুদ্ধে 'ইকোনমিস্ট' যা বলেছে তা মূলত: উস্কানিমূলক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের ব্যাপক আইন ব্যবস্থার জন্যও বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন রয়েছে। যাদেরকে ওলামা বলা হয়। সত্যিকার ওলামারা কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে মূর্খতা। ইসলাম সম্পর্কে মুর্খতা অবশ্যই দূর করতে হবে। নারীদেরকে অবশ্যই তাদের অধিকার দিতে হবে।

তাদের আগের বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে এবং সত্বর। পাশ্চাত্যের কোনো উস্কানির অপেক্ষা না করেই আমাদের তা করতে হবে।

www.pathagar.com

তসলিমা নাসরিনের একাডেমিক ডিজঅনেস্টি

বছর খানেক পূর্বে[১] আমি তসলিমা নাসরিনের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। আমি দেখতে পাই যে, তিনি নারী অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম এবং পুরুষের প্রতি বিদ্বেষেও ভুগছেন। তার লেখা পড়লে তাকে নাস্তিক বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে তার প্রকাশিত বই 'তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম' (১৯৯১) থেকে দু'টি অংশ উদ্ধৃত করছি :

ক. "এই পৃথিবীতে পুরুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু কথা তৈরি করেছে। ওই কথার মধ্যে কিছু নাম দিয়েছে ধর্ম, কিছুর নাম আইন।"(পৃষ্ঠা : ৪৩)

খ. "কারা যেন আমার মাকে বুঝিয়েছে ধর্মকর্মে মন দিলে হবে অপার শান্তি লাভ। মা একটি ভুল বিশ্বাস নিয়ে গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন, শেষ রাতে সুর করে দুলতে দুলতে পড়েন ' ফাবিআইয়ে আলাই- রাবুকা।" (পৃষ্ঠা : ৪৭)[২]

তসলিমা নাসরিন নারী অধিকারের নামে এমন Extreme চিন্তাধারায় পৌঁছে গেছেন, যা পাশ্চাত্যের কোনো Faminist-ও পৌঁছাননি। এ প্রসঙ্গে তার পুস্তকের দু'টি অংশ উল্লেখ করছি :

ক. "নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত হোক। নারী খাদ্যের ভূমিকায় না এলে তার খাদ্য নামের কলংক ঘুচবে না। এখন ভাল কথার যুগ নয় নীতি বাক্যের সময় নয়। কাটা দিয়েই আজকাল কাটা তুলতে হয়।"(পৃষ্ঠা : ১০৭)

খ. "নারী যতদিন ছিঁড়ে খুঁড়ে, পুরুষ না খাবে, নারী যতদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিণ্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ না করবে, ততদিন নারীর রক্তমাংসে মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাববার সংস্কার দূর হবে না।" (পৃষ্ঠা : ১০৬-১০৭)

যে ব্যক্তি 'নারী ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত হোক' প্রচার করেন তার কাছ থেকে মানবজাতি বা নারী সমাজ কি কল্যাণ আশা করতে পারে! ইসলামই বা তার কাছে কি সুবিচার ও সদ্ব্যবহার আশা করতে পারে। এ রকম ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট এবং মানবতাবিরোধী ছাড়া আর কি বলা যায়?

তার বই পড়ে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে কোনো Systematic পড়াশুনা করেননি। অনেক অমুসলিমের মতো তিনিও শুধু সমালোচনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন। তার কৌশল হচ্ছে- (ক) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামের খণ্ডচিত্র তুলে ধরা; (খ) কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের অপব্যাখ্যা করা এবং

১। এ লেখাটি ১৯৯২ সনে লেখা।

২। লেখিকা কুরআনের উচ্চারণ ভুলভাবেই লিখেছেন।

www.pathagar.com

(গ) কুরআন ও শক্তিশালী হাদীসের পরিবর্তে দুর্বল বলে গণ্য হাদীসকে ভিত্তি করে একটি মতে পৌঁছা এবং তার উপর আক্রমণ চালানো।

এসব কৌশল অবলম্বন করা অন্যায়। এটা কোনো academic নিয়মও নয়। এভাবে কোনো আদর্শ বা ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে না। তার বই থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি : তিনি তার গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন "মুহাম্মদ এও বলেছেন : 'ঐ স্ত্রীলোক অতি উত্তম, যে দেখিতে সুন্দরী এবং যাহার মোহর অতি নগণ্য' (দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোককে মহানবীও অপছন্দ করতেন)।" তিনি হাদীসটির কোনো রেফারেন্স দেননি। সুতরাং হাদীসটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তার মন্তব্য যে, 'দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোককে মহানবীও অপছন্দ করতেন – তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে বুখারী, মুসলিমের মতো গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "চারটি গুণের কারণে একটি মেয়ের বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয় : তার ধনমাল, তার বংশ গৌরব– সামাজিক মান-মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই গ্রহণ কর" (পরিবার ও পারিবারিক জীবন, মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা : ১১১)।

কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে সৌন্দর্যকে মান-মর্যাদা অথবা শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি করা হয়নি। কুরআনের সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে, "ইন্না আকরামাকুম এন্দাল্লাহে আতকাকুম" অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সম্মানিত সে, যে বেশি মুত্তাকি বা আল্লাহর অনুগত। এ ব্যাপারে নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই।

কোনো বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জানতে হলে ঐ সম্পর্কে কুরআনের মূল বিধান দেখতে হবে। ঐ সম্পর্কে কুরআনে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত থাকলে তাও দেখতে হবে এবং তারপর দেখতে হবে রাসূল (সা.) এর নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ বা হাদীসে কী আছে এবং এসবের সমন্বিত ব্যাখ্যা করতে হবে। তা না করার কারণেই তসলিমা নাসরিন বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে পারছেন যে তিনি অসুন্দরী নারীদের অপছন্দ করতেন।

মোহরানা সম্পর্কের ঐ একই কথা। কুরআন ও সুন্নাহ'য় মোহরের কোনো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। দুই পক্ষের সম্মতির উপরেই তা নির্ভর করবে।

নাসরিনের আর একটি মারাত্মক অপব্যাখ্যার উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি লিখছেন : মুসলিম হাদীস শরীফে লেখা 'দুনিয়ার সবকিছু ভোগের সামগ্রী আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে মেয়ে মানুষ।' বিনিময় পণ্য হিসাবে, মূল্যবান দাসী হিসাবে, দামী সামগ্রী হিসাবে সমাজে নারীর অবস্থান বলেই নারীকে 'মাল' বলে ডাকতে কারো দ্বিধা নেই। ওরা ডাকে, কারণ ধর্ম ওদের ইন্ধন জোগাচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ওদের আশকারা দিচ্ছে (পৃষ্ঠা : ১৪)। অথচ তিনি রাসুলুল্লাহর (সা.) মূল উদ্দেশ্য বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। মূল হাদীসটি নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

"ইন্নাদুনিয়া কুল্লাহু মাতাউন ওয়া খাইরু মাতা ইদ্দুনিয়া আল মারাতুন সালেহাতুন।" অর্থাৎ 'দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মপ্রাণ স্ত্রী।' এই হাদীসে কেবল নারীকে নয় পুরুষসহ সবকিছুকেই সম্পদ বলা হয়েছে। অনেকটা আধুনিক অর্থনীতির মতো, যেখানে মানুষকে মানব সম্পদ বলা হয়। এই হাদীসে সবকিছুকে সম্পদ বললেও সবকিছুকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়নি। এমনকি সকল নারীকেও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়নি। কেবল চরিত্রবান এবং সৎস্বভাবের নারীকেই "সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ" বলা হয়েছে। সৎ নারীকে সম্মান দেখানোই ছিলো রাসূলের (সা.) উদ্দেশ্য। অথচ নাসরিন তার কি অপব্যাখ্যাই না করলেন।

'সূরা নিসা'র ৩৪ নং আয়াতের একটি অংশের ভিত্তিতে নাসরিন বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম নারীকে কোনো সম্মান দেয়নি। বরং স্ত্রীকে প্রহার করতে শিক্ষা দিয়েছে (পৃষ্ঠা ৬০-৬১)। একথা তিনি পুস্তকের বিভিন্ন অংশে বলেছেন। এখানে তিনি ইসলামের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন এবং নারী বা স্ত্রীর প্রতি ইসলাম কি আচরণ করতে বলেছে তার মূল বিধান তিনি গোপন করেছেন। অথচ ইসলামে স্ত্রীর প্রতি কি আচরণ করতে হবে এ সম্পর্কিত মূল বিধানসমূহ নিম্নরূপ :

ক. "আর স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, সৎভাবে জীবন-যাপন করো।"(সূরা নিসা, আয়াত-১৯)

খ. "নারীর প্রতি সদাচরণ কর।"(বুখারী ও মুসলিম)।

গ. "যার চরিত্র-ব্যবহার উত্তম সেই পূর্ণ ঈমানদার. আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো" (তিরমিযী)।

এছাড়া স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি রাসূলের (সা.) আচরণ আমরা সবাই জানি এবং তাই হচ্ছে সুন্নত বা রাসূলের (সা.) শিক্ষা যা অনুসরণে মুসলিমগণ নির্দেশিত। ইসলামের এই মূল বিধান উল্লেখ না করে কুরআনের এক ব্যতিক্রমী নির্দেশকে নাসরিন তার আলোচনার ভিত্তি করেছেন। ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যতিক্রমী নির্দেশের আয়াত অংশটি নিম্নরূপ "যদি তোমরা স্ত্রীর পক্ষ হতে 'নুশুজ' (অর্থাৎ Persistent disobedience বা সব সময় অবাধ্যতা, বিদ্রোহ) আশংকা করো তবে তোমরা বোঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাক এবং (হালকাভাবে) মারো[৩] ও তারা যদি অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতো তালাশ করো না" (সূরা নিসা, আয়াত ৩৪)। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, পরিবার রক্ষা করা এবং তালাককে যতটা সম্ভব প্রতিহত করা। তদুপরি ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা। আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, পরিবারের Senior Partner হিসেবে এবং অধিকতর শক্তিশালী হিসেবে পুরুষ পরিবারে স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নারীকে নির্যাতন করতে পারে। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিধান

৩। কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ (যেমন : ড. আবদুল হামিদ আবু সুলেমান দারাবা শব্দের অনুবাদ করেছেন পৃথকভাবে অবস্থান করা যায় বা দূরে চলে যাওয়া Chastising Women. A meens to resolv Marital Problems Publications.

www.pathagar.com

হচ্ছে অবাধ্যতার ক্ষেত্রেও মূলত বোঝাতেই চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজনে কিছু দিন আলাদা থাকতে হবে। সর্বশেষ পদ্ধতি হিসেবে শাসনের কথা বলা হয়েছে, যা পরিবারকে রক্ষার সর্বশেষ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু রাসূল (সা.) এই পদ্ধতি অনুসরণ করেননি এবং তা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলের (সা.) বক্তব্য নিম্নরূপ :

ক. "তোমাদের স্ত্রীদের মুখের উপর মারবে না, মুখমন্ডলের উপর আঘাত দেবে না, তাদের শ্রী নষ্ট করবে না, তাদের গালাগাল করবে না।"(আবু দাউদ)

খ. "তোমাদের স্ত্রীদের আদৌ মারবে না এবং মুখ মন্ডলকেও কুশ্রী ও কদাকার করে দিও না।"(আবু দাউদ)

গ. "আল্লাহর দাসীদেরকে তোমরা মারধোর করবে না।" (আবু দাউদ)

পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের ব্যতিক্রমধর্মী বিধানকে ভিত্তি করে নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা ব্যাখ্যা করার Academic honesty নয়। নাসরিন এই Acadamic dishonesty প্রায় সবখানেই করেছেন। তার বইয়ের অনেক স্থানে এর আরো উদাহরণ রয়েছে। নাসরিন তার লেখা দ্বারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তার লেখা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোনো ক্ষতিই হবে না। ইসলামের উপর এর চেয়ে অনেক ঘোরতর আক্রমণ বিভিন্ন কর্ণার থেকে এসেছে যা ইসলামের পণ্ডিতগণ মোকাবিলা করেছেন এবং করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা

তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে পূর্বের প্রবন্ধে আমি তার Academic dishonesty, কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যার উদাহরণ দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে তার বই "নির্বাচিত কলাম"– এ উল্লেখিত আরো কিছু অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করা হবে। তার পুস্তকে দেখা যায় যে তিনি যতই নারীর স্বপক্ষে বলেছেন বলে দাবী করুন না কেন, মূলত তিনি নারীর মান সম্মানের প্রতি মোটেই পরোয়া করেন না। তিনি ইরানের নারীদের সম্পর্কে তার পুস্তকে লিখেছেন : "আমার বেশ ক'জন চিকিৎসক বন্ধু ইরান থেকে ফিরে এসে ওখানকার গল্প বলেছেন। তারা যে কথাটি সবচেয়ে বেশি বলেন তা হলো ইরানী মেয়েরা পা থেকে মাথা অব্দি ঢেকে রাখে বটে তবে চিকিৎসকদের কাছে অসুখ দেখাতে এসে নিজে থেকেই পুরো কাপড় খুলে উলংগ হয়ে শুয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে ওদের শরীরে বিশেষ কোনো অসুখ খুঁজে পান না। ওদের অসুখ আসলে মনে।"

"আমার চিকিৎসক বন্ধুরা ইরানী মেয়েদের শরীরের বড় প্রশংসা করেন। কড়ে আঙ্গুলে ব্যাথার কথা বলে পুরা উলংগ হয়ে যাওয়া মেয়েদের গা টিপে টিপে দেখতে হয় আর কোথাও ব্যাথা আছে কিনা, না হলে ওরা রাগ করে। পরাধীনতা মানুষকে অসুস্থ করে, বিকৃত করে, মন ও শরীরকে পঙ্গু করে। পরাধীন শরীরকে সুযোগ পেলেই যেখানে সেখানে স্বাধীন করতে চায়। এতে ওদের স্বাধীনতা সামান্য অর্জন হয় না বরং বিদেশী পুরুষদের চোখের খানিকটা আরাম হয়" (নির্বাচিত কলাম, বাংলাদেশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০)।

তসলিমা নাসরিন তার কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধুর বক্তব্যের ভিত্তিতে ইরানের মেয়েদের বিরুদ্ধে এরকম ঢালাও অসম্মানজনক অশালীন বক্তব্য কিভাবে রাখতে পারলেন? কোনো জাতির বিরুদ্ধে এরকম ঢালাও মন্তব্য রাখা কি আইন, নৈতিকতা ও বিবেকসম্মত? তসলিমা নাসরিন যতই বিবেকের কথা বলুন মূলত তার বিবেক বা ভদ্রতা বলে কিছু নেই। অন্যদের তিনি নারী বিদ্বেষী বলে যতই অভিযোগ করুন, নারীদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্যে তার কোনো জুড়ি নেই। তার উপরোক্ত উদ্ধৃতিই এর বড় প্রমাণ। তাকে নারী দরদি বলা কেবল প্রতারণা মাত্র। নারীর প্রতি অসম্মানজক এসব মন্তব্যের জন্য তার লজ্জা হওয়া উচিত। নারীদের উচিত তার নিন্দা করা, তাকে ধিক্কার দেয়া।

পর্দা বা ইসলামের পোশাকের বিধান (ইসলামের পরিভাষায় যাকে 'হিজাব' বলা হয়) সম্পর্কে তিনি তার 'নির্বাচিত কলাম' পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে নিন্দাবাদ করেছেন (দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা ৩৬ ও ৭৬ বাংলাদেশে প্রকাশিত সংস্করণ)। আল্লাহর নির্ধারিত এ বিধানের প্রতি তার বিদ্বেষ কত তা তার পুস্তকের ৭৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে বোঝা যায় :

www.pathagar.com

"লাহোরের মেয়েরা এই সেদিন তাদের বাড়তি কাপড় আগুনে পুড়িয়েছে। অশিক্ষিত মেয়েরা কাপড়ের উপর কাপড় চাপিয়ে নিজের জড়বুদ্ধি, স্থূলদর্শিতা ও অনুর্বর মস্তিষ্ক ঢেকে রাখে। ধর্ম তাকে কুৎসিত বানিয়েছে, তাই ধর্ম তাকে ঢেকেছে।"

তসলিমা নাসরিনের কথায় মনে হবে পাকিস্তানের লাহোরের মেয়েরা বোধ হয় ইসলামী শালীনতা (চাদর বা হিজাব) পরিত্যাগ করেছে। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তার বিপরীত। পাকিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষিত মেয়ে ইসলামের বিধান মেনে চলে। এমন কি অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ডে শিক্ষিতা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী বেনজীর ভুট্টোও চাদর পরেন। এটা কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজনে বেনজীর ভুট্টো চাদর পরেন বললে তাঁকে ছোট করা হবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মুসলিম মেয়েরা (সরকার চান বা না চান) হিজাব বা ইসলামী পোশাকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এটা মিসর, জর্দান, আলজিরিয়া, সুদানসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশের বেলায় সত্য। এটা এসব দেশে তারা স্বাধীনভাবেই করেছে। কোনো চাপে নয়। আমাদের দেশেও ইসলামী হিজাবের (আবরণের) ব্যবহার বাড়ছে। এসব প্রমাণ করে যে, ইরানের মতো দেশে যদি চাপ নাও থাকত তাহলেও অধিকাংশ মুসলিম মেয়ে তাদের ঈমানের দাবী হিসেবেই ইসলামী হিজাব গ্রহণ করতো।

তসলিমা নাসরিনের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে মনে হবে যারা চাদর পরে তারা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্থূলদর্শী ও তাদের মস্তিষ্ক অনুর্বর। এ ধরনের বক্তব্য কোনো বিবেকবান ও সংযত ব্যক্তি করতে পারে কি? তসলিমার বিবেক বলে কিছু আছে কি? তসলিমা ইসলামী হিজাব বা আবরণকে কুৎসতি বলেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানতো চাদর বা ম্যাক্সির সঙ্গে স্কার্ফের ব্যবহারকে অত্যন্ত শালীন ও সুন্দর মনে করেন। তাকে কখনো অসুন্দর মনে করেন না। মূলত: মুসলিম মেয়েরা ক্রমেই পাশ্চাত্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেহায়াপনাকে পরিত্যাগ করছে এবং ইসলামী হিজাবকেই তাদের জন্য সুন্দর ও সম্মানজনক মনে করছে। ইসলামে পোশাক ও হিজাবের বিধান যারা জানতে চান তারা আল কুরআনের সূরা আরাফের ২৬ ও ২৭ আয়াত, সূরা নূরের ৩১ আয়াত ও সূরা আহ্যাবের ৫৯ আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা কোনো তাফসীর থেকে দেখে নিতে পারেন।

তসলিমা তার পুস্তক নির্বাচিত কলামের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের হুদুদ অধ্যাদেশ এবং কিসাস ও দিয়াত আইনের খসড়ার উপর নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

"যেনার সর্বোচ্চ শাস্তি হদ যা বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু এবং অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একশ' বেত্রাঘাত। হদের জন্য প্রয়োজন চারজন পুরুষ মুসলমানের সাক্ষ্য। নারী বা অমুসলমান সাক্ষ্য দ্বারা হদের শাস্তি দেয়া যায় না। ধর্ষণকারীকে শাস্তি দেয়ার জন্য চারজন পুরুষ মুসলমানের সাক্ষ্য প্রমাণের বিধান রাখবার অর্থ– অপরাধীকে রক্ষা করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুবিচার থেকে বঞ্চিত করা।"

"এটা খুবই অস্বাভাবিক যে কোনো পুরুষ চারজন পুরুষের সামনে ধর্ষণ করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয়। চারজন নারীর সামনে একজন নারীর ধর্ষণ করার ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু

www.pathagar.com

নারী সাক্ষ্য দিলে সর্বোচ্চ শাস্তি হদ প্রযোজ্য হয় না। নারী গর্ভধারণ করলে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অথচ যে পুরুষের দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয় সে রেহাই পেয়ে যায়।"

"পাকিস্তানের ইসলাম মতাদর্শ পরিষদ ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে কিসাস ও দিয়াত আইনের খসড়া প্রস্তুত করে। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হত্যা, শারীরিক ক্ষতি ও গর্ভপাতের সকল দিক এ আইনের আওতাধীন। আইনের ২৫ (বি) অনুচ্ছেদে বলা হয় কাতেল খাতা (অনিচ্ছাকৃত খুন) অপরাধের শিকার নারী হলে দিয়াতের শাস্তি হবে একজন পুরুষ হলে যা হতো তার অর্ধেক।"

"আইনের চোখে একজন শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম নারী একজন শিক্ষিত ও অনুপার্জনক্ষম পুরুষের চেয়ে কম মূল্যবান।"

মূল আলোচনার সুবিধার্থেই এই বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেয়া হলো। প্রধানত এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামী আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে পাকিস্তানের এ আইন সম্পর্কে আমাদের এ আলোচনার কোনো প্রয়োজন পড়ত না। দ্বিতীয়ত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের আইনই ইসলামের একমাত্র মডেল নয়। ইমাম আওজায়ী ও ইমাম জুহরীর মতে হদুদের ক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (দ্রষ্টব্য : আব্দুল কাদের আওদাহ শহীদ, ইসলামের দণ্ডবিধি আইন আততশরীহ আল জানায়ী' ফিল ইসলাম; দ্বিতীয় খন্ড ৩১৫ পৃষ্ঠা)। তৃতীয়ত তসলিমা পাকিস্তানের আইনে হদুদ অর্ডিনান্স মোতাবেক হদের শাস্তি প্রয়োগের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলে কি শাস্তি হবে তার উল্লেখ করেননি। বিষয়টির যথাযথ উপলব্ধির জন্য তার এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। সে ক্ষেত্রে অর্থাৎ চারজনের কম সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে অথবা কেবল নারীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে উক্ত অধ্যাদেশে যেনা বিল যবর (অর্থাৎ ধর্ষণের ক্ষেত্রে) পঁচিশ বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে (ধারা ১০) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে (অর্থাৎ সম্মতির ভিত্তিতে যেনা সংগঠিত হলে) দশ বৎসরের জেলের বিধান রাখা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শাস্তি ছাড়া ছেড়ে দেয়া হয়নি। চতুর্থত পুরুষ গর্ভধারণ না করলেই রেহাই পেয়ে যায় একথা তার একেবারেই যথার্থ নয়। পুরুষ হোক বা নারী হোক শাস্তির পরিমাপের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানে কোনো পার্থক্য নেই এবং কোনো ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য ছাড়া শাস্তি দেয়া যায় না। আধুনিক আইনেও নারী হোক পুরুষ হোক, সাক্ষ্য ছাড়া ধর্ষণ বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো শাস্তি দেয়া হয় না। হদুদ অর্ডিনান্স মোতাবেক যদি পুরুষের অপরাধ প্রমাণিত হয় তবেই তার শাস্তি হবে। না হলে নয়। এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কথা। সাক্ষ্য ছাড়া কারো শাস্তি হতে পারে না। নারীদেরকেও কেবল সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

নারীদের কেবল গর্ভধারণের ভিত্তিতেই যেনার জন্য দায়ী করা যেতে পারে না। যদি নারী ধর্ষণের কোনো অভিযোগ যথা সময়ে নিয়ে আসে এবং তা গ্রহণ করার মত কিছু ভিত্তি থাকে তাহলে তার উপর হদ প্রযোজ্য হবে না। কোনো সন্দেহ থাকলেই হদ কার্যকর করা যায় না (দ্রষ্টব্য : সূরা নূরের তাফসীর, তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী)।

www.pathagar.com

নারী-পুরুষের দিয়াতের (অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থের) পরিমাণ সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে বিতর্ক নিশ্চয়ই আছে। এ বির্তকের মূল কথা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ মোতাবেক হবে। নারীর দিয়াত যদি কমও নির্ধারিত হয় তবে তার জন্য যে কম অর্থ পাওয়া যায় সে কম অর্থের উত্তরাধিকারী পুরুষ নারী সবাই হয়। এর ফলে কেবল নারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ কথা বলা যায় না। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের কিসাস ও দিয়াত আইনে নারীর দিয়াত কম হবে তা বলা হয়নি। ধারাটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

The Court shall, subject to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah and keeping in view the financial position of the convict and the heirs of the victim, fix the value of diyat which shall not be less than the value of thirty thousand six hundred & thirty grams of silver (Criminal Law (Fourth Amendment) Ordinance 1991, Amendment of Section 323 of Penal Code).

এ বিতর্ক অবশ্যই হতে পারে যে, ইসলামের দন্ডবিধি কোন সময়ে কার্যকর করা হবে। কিন্তু ইসলামী পন্ডিতগণ এ কথা মনে করেন যে, আধুনিক আইন নয় বরং ইসলামী আইনের মাধ্যমেই অপরাধ দূর বা বন্ধ করা সম্ভব। পাশ্চাত্য আইন দ্বারা দুনিয়ার কোথাও অপরাধ দমন করা যায়নি।

তিনি তার পুস্তকের ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় কতকগুলো হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এসব হাদীসের রেফারেন্স তিনি দেননি, তিনি প্রায় জায়গাতেই হাদীসের বিস্তারিত রেফারেন্স দেননি। এসব হাদীসের সর্বোচ্চ মানের (সহীহ) না দুর্বল না মওজু (জাল) তার তিনি উল্লেখ করেননি। এসব হাদীসের সনদ (সূত্র) সম্পর্কেও তিনি হাদীসবিদদের বক্তব্যের কোনো আলোচনা করেননি। এসব হাদীস মুতাওয়াতার (অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত) না মশহুর (অনেক সূত্রে বর্ণিত) না খবরে ওয়াহেদ (কম সূত্রে বর্ণিত) তারও তিনি উল্লেখ করেননি।

এসব কারণে তার উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা সম্ভব হলো না। তবে তসলিমা নাসরিনের হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। ইসলামের কোনো ব্যাপারেই তার মন্তব্য করার মত পড়াশুনা নেই তা সুস্পষ্ট। উসূলুল ফিকাহ (ইসলামের আইন বিজ্ঞান) বা উসূলুল হাদীস (হাদীসের নীতিমালা) সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকায় তার পক্ষে কেবল ব্যাখ্যা নয় অপব্যাখ্যা করাই সম্ভব।

হাদীসের প্রত্যেক পন্ডিতই জানেন যে, কুরআনের প্রত্যেক আয়াতই মুতাওয়াতার (অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত বলে অভ্রান্ত) কিন্তু সকল হাদীস তেমন নয়। হাদীস সংগ্রহ কুরআনের মতো হয়নি। এ দু'য়ের সংগ্রহের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ জন্য ইসলামের পণ্ডিতগণ মওজু (জাল) হাদীসকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিহ্নিত করেছেন। এসব

www.pathagar.com

হাসীসকে তারা ঈমান বা আমলের জন্য ভিত্তি করেননি। জয়ীফ বা দুর্বল হাদীসকে কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের সহায়ক যুক্তি বা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তারা কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসকেই ইসলামী আইন ও ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তি ধরেছেন।

তাই তসলিমাকে কেবল এটাই বলা যায় যে, হাদীস ও তার নীতিমালা (উসূল) সম্পর্কে না জেনে এবং কোন সব হাদীসকে ইসলামের ঈমান ও আমলের ভিত্তি করা হয়েছে বা অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, না জেনে হাদীস উদ্ধৃত করে বা অপব্যাখ্যা করে আপনি কেবল ইসলামের দুশমনদের বাহবাই পাবেন। কিন্তু বাস্তবে সত্যের, কল্যাণের, মানবতার বা নারীদের কোনো সেবা করতে পারবেন না। আপনার মত অন্ধকে পথ দেখানো খুবই মুশকিল। তবে আপনি যদি একবার আপনার জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন তবে আপনার মুক্তির একটি রাস্তা আপনি পেতেও পারেন।

ইসলামের কোনো শিক্ষাকেই যথার্থ অর্থে উপলব্ধি না করা তসলিমার এক রোগ এ কারণেই তিনি মুসলিম ও তিরমিজী বর্ণিত দু'টি হাদীস উল্লেখ করে মন্তব্য করেন। "আমার তবু বিশ্বাস হয় না এই সত্য যুগে ছাপার অক্ষরে পৃথিবীতে কোনো নারীর প্রতি এই অবিচার, এই অমর্যাদা প্রচারিত হয় এবং এই অন্যায়গুলোই সাদরে গৃহীত হয় সমাজে, সমাজে ভদ্র লোকেরা পরম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন যাবতীয় ধর্মীয় বর্বরতা" (নির্বাচিত কলাম, পৃষ্ঠা-৩১)।

তিনি এখানে হাদীসের রেফারেন্স দিয়েছেন তবে উল্টা পাল্টা করে। যা হোক আমি হাদীস দু'টি যথার্থ রেফারেন্স সহ উল্লেখ করছি :

"স্বামী যখন নিজের প্রয়োজন (অর্থাৎ যৌন প্রয়োজন) পূরণ করার জন্য স্ত্রীকে আহবান করে তখনই তার সাড়া দেয়া উচিত। এ সময় সে চুলার কাছে থাকলেও (অর্থাৎ রান্নায় লিপ্ত থাকলেও)" (ইমাম তিরমিজী কর্তৃক বর্ণিত)।

"যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে শয্যায় ডাকবে সে তাতে রাজী না হলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন যতক্ষণ স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়" (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

এসব হাদীসের তাৎপর্য কি ? এ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখছেন :

"এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া স্বামীর শয্যার স্থান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ" (ইমাম নববী, মুসলিমের ব্যাখ্যা)। দ্রষ্টব্য : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-২৮৯)।

ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে মত দিয়েছেন :

"অধিক মাত্রায় যৌন সংগম যদি স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে তার সামর্থ্যের বাইরে বেশি যৌন সংগম করা জায়েজ নয়।"

(দুররে মুখতার, বাবুল কিসাম, দ্রষ্টব্য : ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৯)।

www.pathagar.com

আরবী ভাষা যারা জানেন তারা বুঝবেন, "চুলার কাছে থাকলেও" শব্দসমূহ বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে। ইসলামের এ বিধান না বোঝার কোনো কারণ নেই। সত্যিকার অর্থে বিবাহের প্রধান লক্ষ্যের একটি হচ্ছে বৈধভাবে যৌন প্রয়োজন পূরণ করা। বিবাহের এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) যা বলেছেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি অস্বাভাবিক কিছু বলেননি। ইসলামে বিবাহের মাধ্যমে যৌন প্রয়োজন সর্বাংশে পূরণ করার অন্য যুক্তি হচ্ছে এর বাইরে যৌন কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সুতরাং এ পথে অসুবিধা দূর করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে হায়েজ (ঋতু) অবস্থায় এবং রমজানে দিনের বেলায় ইসলাম যৌনকর্ম নিষিদ্ধ করেছে। যৌন জীবনকে যে ইসলাম কেবল ভোগবিলাস হিসেবে দেখেনি এসব তার প্রমাণ।

এই যেন মিলনের দাবী কেবল পুরুষ নয় নারীর বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআন বলছে :

"নারীদের পুরুষদের উপর সেই অধিকার রয়েছে যা পুরুষদের নারীদের উপর রয়েছে" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৮)।

তসলিমা নাসরিন এসবের মধ্যে কিভাবে বর্বরতা পেলেন বা কিভাবে অত্যাচার ও অমর্যাদা পেলেন তা বোঝা কঠিন। তিনি বরং চাইলে দেখতে পেতেন ইসলামে যথার্থ অর্থে কোনো অবিচার নেই, ছাপার অক্ষরে বা প্রচার মাধ্যমে নারীর অমর্যাদা অবিচার আছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পর্ণসাহিত্যে, ফিল্মে, নারী ব্যবসায়, পতিতাবৃত্তিতে, ফ্যাশন শোতে, মডেল হওয়ার মতো বিভিন্ন পেশাতে।

www.pathagar.com

ইসলামে পোশাকের দর্শন ও বিধানাবলী

পুরুষ ও স্ত্রী লোকের পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইসলামী আইন যথাযথ উপদেশ ও নির্দেশনা দান করেছে। ইসলাম যথাযথ পোশাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে দু'টি বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রথমত মানব দেহ ঠিকমত আচ্ছাদন করা। কারণ, বিশ্রীভাবে দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত সৌন্দর্যায়ন ও ভূষণ বাড়িয়ে তোলা।

আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে বলা হয়েছে, "হে আদমের সন্তানগণ! আমরা তোমাদের নিকট পোশাক পাঠিয়েছি। তোমাদের দেহের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য এবং সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য। সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে খোদাভক্তির পোশাক" (সূরা : আল-আরাফ, আয়াত-২৬)।

দেহ ঠিকমত আচ্ছাদন করা ও ভূষণের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। যদি এই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে শয়তানের পথ অনুসরণ করা হবে। এ সম্পর্কে কুরআন বলে, "ওহে আদম সন্তানগণ! শয়তান তোমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে যেভাবে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছিল এবং তাঁদেরকে তাঁদের লজ্জাস্থান উভয়ের সামনে দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল, তোমাদেরকে শয়তান যেন সেভাবে প্রলুব্ধ না করতে পারে" (সূরা : আল-আরাফ, আয়াত-২৭)।

পুরুষ ও স্ত্রী লোকের জন্য এই ধরনের পোশাক পরিধান করতে ইসলাম অনুমতি দেয়নি। ইসলাম পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যকার প্রভেদ রক্ষা করতে চায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একে অপরের পোশাক পরিধানের মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "পুরুষের স্ত্রীলোকের মতো পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ।" (বুখারী শরীফ)

ইসলাম পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহারে জাঁকজমক ও আড়ম্বর নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে বলেছে, "আল্লাহ জাঁকজমকপূর্ণ (গর্বিত) লোককে পছন্দ করেন না" (সূরা : আল-হাদিদ, আয়াত-২৩)। ইসলামের নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জাঁকজমক বা গর্ব দেখানোর জন্য তার পোশাক জমি পর্যন্ত স্পর্শ করায় (বিনা কারণে পোশাক লম্বা করে) আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে তার দিকে তাকাবেন না। (বুখারী শরীফ)

পোশাক পরিচ্ছদ অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। কারণ, ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন কর। কারণ ইসলাম ধর্মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে" (ইবনে হাব্বান)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্ত্রী লোকদেরকে স্বর্ণালংকার ও সিল্কের বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি এগুলো পুরুষদের পরিধান করার অনুমতি দেননি। এর কারণ সম্ভবত এগুলো স্ত্রীলোকদের জন্যই প্রকৃতিগতভাবে উপযুক্ত এবং পুরুষদের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয়।

www.pathagar.com

পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবশ্যই শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে। নবী (সা.) এর সুন্নাহ হচ্ছে যে, মানুষ তার দেহ যথাযথভাবে আচ্ছাদন করবে।

যাই হোক, পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। এছাড়া অন্যান্য অংশ বিভিন্ন কারণে খোলা রাখা যেতে পারে।

স্ত্রীলোক অবশ্যই তার দেহ যথাযথভাবে ঢেকে রাখবে। নবী (সা.) বলেছেন যে, একটি বয়স্ক মেয়ের জন্য তার দেহ খোলা রাখা ঠিক নয়। সে অবশ্য তার মুখমণ্ডল ও হাতের সামনের অংশ খোলা রাখতে পারে (আবু দাউদ)।

নবী (সা.) আরো বলেছেন যে, স্ত্রীলোকদের এমন পাতলা পোশাক পরতে অনুমতি দেয়া হয়নি যা তার শরীর দেখাতে পারে (মুসলিম)। ইসলাম মেয়েদের বয়স হওয়ার পর ভালো করে বুক ঢেকে ওড়না পরতে বলেছে।

ফ্যাশনের নামে অনেক কিশোরী ও যুবতী ওড়না পরা বাদ দিয়েছে। অনেকে আবার গামছার মতো ওড়না গলায় জড়িয়ে রাখছে অথবা একদিক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে। ওড়না গামছা নয়। যা দিয়ে ভালো করে মাথা ও বুক ঢাকা হয় না তাকে ওড়না বলা চলে না। এই প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন।

সূরা নূরের ৩১ আয়াতে আল্লাহ পাক নারীদের ওড়না পরার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো : "মুসলিম নারীদেরকে বলুন যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত করে (সূরা : নূর, আয়াত-৩১)।

উপরের বিধান ঘরে বাইরে দু'খানেই প্রযোজ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত রাখার ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে 'খুমুর' (এক বচন 'খিমার') শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'খিমার' শব্দের অর্থ ওড়না বা চাদর জাতীয় পোশাক। জাহেলিয়াতের যামানায় স্ত্রীলোকেরা মাথার উপর এক প্রকারের চাদর দ্বারা পেছনের খোঁপা বেঁধে রাখত। সম্মুখের দিকের বোতাম খোলা থাকত। এতে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্ট দেখা যেত। বুকের উপর কোর্তা ছাড়া আর কিছু থাকত না। (ইবনে কাসীর, কাশশাফ, মুহাম্মদ আসাদ লিখিত মেসেজ অব দি কুরআন, মাওলানা মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের তাফসীর অংশ)। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমান নারী ও কিশোরীদের মধ্যে ওড়না ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয়। ঈমানদার মহিলারা এ নির্দেশ শুনে অনতিবিলম্বে তদনুযায়ী আমল শুরু করেন। এর প্রশংসা করে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, যখন সূরাটি নাযিল হয় তখন নবী করীম (সা.) এর নিকট হতে লোকেরা শুনে নিজেদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদেরকে এ আয়াতের কথা শুনায়। আয়াত শুনে প্রত্যেকে উঠে ওড়না বা চাদর নিয়ে নিজেদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নেয়। পরের দিন ফজরের নামাজে যত স্ত্রীলোকই মসজিদে নববীতে হাজির হয় তারা সকলেই ঐভাবে ওড়না বা চাদর পরা ছিল। এ পর্যায়ের আর একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, নারীরা পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে মোটা কাপড়ের ওড়না বানিয়ে নিয়েছিল (তাফসীরে ইবনে কাসীর, আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের তাফসীর)।

www.pathagar.com

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয় যে, মাথা ও বুক ঢেকে নারী ও কিশোরীদের ওড়না পরার নির্দেশ কুরআন থেকে এসেছে। এটা কারো বানানো বিধান নয়। অথচ অধিকাংশ লোক জানে না যে, ওড়না পরা কুরআনের নির্ধারিত অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে 'গায়ের মাহরামদের' (অর্থাৎ যাদের সঙ্গে কোনো নারীর বিবাহ বৈধ) সামনে মাথা ঢাকা ফরজ এবং চেহারা, হাতের সামনের অংশ ও পায়ের পাতা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা বৈধ নয় (আবু দাউদ ও হিদায়া, নজর অধ্যায়)।

পোশাকের ফ্যাশনের নামে কুরআনের বিধান অমান্য করে আজ ওড়না ওঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা অনেকে করছেন। অনেক বয়স্ক মেয়েকে ওড়না ছাড়া বাইরে চলাফেরা করতে দেখা যায়। টেলিভিশনের অনেক অনুষ্ঠানাদিতেও ওড়না ছাড়া মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে ও অংশগ্রহণ করতে দেয়া হচ্ছে। অথচ ওড়না ব্যবহারে ইসলামী শালীনতার সর্বোত্তম উদাহরণ। বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে এ সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ কার্যকর করা।

এছাড়া পোশাক প্রস্তুতকারকদের কর্তব্য উপযুক্ত ওড়না ও সেলোয়ারসহ পোশাক ডিজাইন করা। পোশাক প্রস্তুতকারকদের প্রভাবিত করা আমাদের কর্তব্য যেন তারা এমন পোশাক ডিজাইন না করে যার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী শিক্ষার বিরোধী বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম স্ত্রী লোকদের সম্ভ্রমের প্রতি মর্যাদা দেয়। তাই ইসলাম স্ত্রী লোকদের তার সাধারণ পোশাকের উপরে চাদর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে, যখন সে কাজের জন্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাইরে যায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে বলেছে "হে নবী! আপনার পত্নী কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রী লোকদিগকে চাদর (মাথা ও বুক আচ্ছাদন করে) পরিধান করতে বলুন। এটাই ভালো স্ত্রীলোকের পরিচয়ের উত্তম পথ এবং এতে করে তাদের কখনও বিব্রত করা হবে না" (সূরা : আল আহযাব, আয়াত-৫৯)। চাদরটি বড় হওয়া সঙ্গত। চাদরের বুনন ভালো হওয়া প্রয়োজন। মহিলাদের দিকে নজর দেয়া নিয়ে বিখ্যাত ফিকাহ্‌র গ্রন্থ হিদায়াতে প্রাথমিক যুগের হানাফি ইমামদের মতামত নিম্নলিখিতভাবে উল্লিখিত আছে, "বেগানা পুরুষের নারীর চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া অন্য অংশের দিকে দৃষ্টি করা যায়েজ নয়"। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, কেবল সে সৌন্দর্য ছাড়া যা সততই প্রকাশ হয়ে পড়ে।" তাছাড়া চেহারা ও হাত প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজ কারবারে লেনদেন করার জন্য। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, পায়ের দিকেও নজর করা জায়েজ। কেননা এর প্রয়োজন অনেক সময় দেখা দেয়। আবু ইউসুফ (রহ.) হতে বর্ণিত আছে হাতের কনুই পর্যন্ত দেখা যায়েজ। কারণ এও অনেক সময় সততই প্রকাশ হয়। তবে কুচিন্তা হতে নিরাপদ না হলে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চেহারার দিকে তাকাবে না" (হিদায়া, নজর অধ্যায়)।

যদি মানব জাতি ইসলাম প্রদত্ত পোশাক পরিচ্ছদের নীতি মেনে চলে, তাহলে তা অবশ্যই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নিশ্চিত করবে এবং একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

ওড়না পরার নির্দেশ ও কুরআন

সূরা নূরের ৩১ আয়াতে আল্লাহ পাক নারীদের ওড়না পরা নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

"মুসলিম নারীদেরকে বলো তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (যেমন ওড়না বা চাদর) দিয়ে আবৃত করে (সূরা নূর, আয়াত-৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ অবলম্বনে)।

২. উপরের বিধান ঘরে বাইরে দু'খানেই প্রযোজ্য। এছাড়া সূরা আহযাবের ৫৯নং আয়াতে মহিলাদেরকে ঘরের বাইরে যাবার সময় চাদর পরে বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত রাখার ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. উপরোক্ত আয়াতে 'খুমুর' (এক বচন 'খিমার') শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'খিমার' শব্দের অর্থ ওড়না বা চাদর জাতীয় পোশাক। জাহেলিয়াতের যামানায় স্ত্রীলোকেরা মাথার উপর এক প্রকারের চাদর দ্বারা পিছনের খোঁপা বেঁধে রাখত। সম্মুখের দিকে বোতাম খোলা থাকত। এতে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্ট দেখা যেত। বুকের উপরে কোর্তা ছাড়া আর কিছু থাকত না (ইবনে কাসীর, কাশশাফ, মুহাম্মদ আসাদ লিখিত মেসেজ অব দি কুরআন, মাওলানা মওদূদীকৃত তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের তাফসীর অংশ)। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমান নারী ও কিশোরীদের মধ্যে ওড়না ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয়। ঈমানদার মহিলারা এ নির্দেশ শুনে অনতিবিলম্বে তদানুযায়ী আমল শুরু করেন। এর প্রশংসা করে হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, যখন সূরাটি নাযিল হয় তখন নবী করিম (সা.)-এর নিকট হতে লোকেরা শুনে নিজেরা তাদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদেরকে এ আয়াতের কথা শুনায়।

আয়াত শুনে প্রত্যেকে উঠে ওড়না বা চাদর নিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নেয়। পরের দিন ফজরের নামাজে যত স্ত্রীলোকই মসজিদে নববীতে হাজির হয় তারা সকলেই ওইভাবে ওড়না বা চাদর পরা ছিল। এ পর্যায়ের আর একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, নারীরা পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে মোটা কাপড়ের ওড়না বানিয়ে নিয়েছিল (তাফসীরে ইবনে কাসীর, আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের তাফসীর)।

www.pathagar.com

৪. উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয় যে মাথা ও বুক ঢেকে নারী ও কিশোরীদের ওড়না পরার নির্দেশ কুরআন থেকে এসেছে। এটা কারো বানানো বিধান নয়। অথচ অধিকাংশ লোক জানে না যে ওড়না পরা কুরআনের নির্ধারিত অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতেও 'গায়ের মাহরামদের' (অর্থাৎ যাদের সঙ্গে কোনো নারীর বিবাহ বৈধ) সামনে মাথা ঢাকা ফরজ এবং চেহারা, হাতের সামনের অংশ ও পায়ের পাতা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা বৈধ নয় (আবু দাউদ, হিদায়া, নজর অধ্যায়)।

৫. পোশাকের ফ্যাশনের নামে কুরআনের বিধান অমান্য করে আজ ওড়না উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা অনেকে করছেন। অনেক বয়স্ক মেয়েকে ওড়না ছাড়া বাইরে চলাফেরা করতে দেখা যায়। টেলিভিশনের অনেক অনুষ্ঠানাদিতে ওড়না ছাড়া মেয়েদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে ও অংশগ্রহণ করতে দেয়া হচ্ছে। অথচ ওড়না ব্যবহার ইসলামী শালীনতার সর্বোত্তম উদাহরণ। কাজেই মুসলিম জনগণের দায়িত্ব এ সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ কার্যকরী করা।

www.pathagar.com

পতিতাবৃত্তি

মানব জন্মের শুরু থেকেই মানুষকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য কাজ করে আসছে। কারণ জীবন ধারণের জন্য এই তিনটি উপাদান অপরিহার্য। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনো পুরুষ, কখনো নারী সংসার নির্বাহের দায়িত্ব নিয়েছে। সংসার নির্বাহের জন্য জীবন ধারণের জন্য সমাজের প্রথম থেকেই কৃষিকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের একটি পর্যায়ে এসে নির্দিষ্টভাবে নারীদেহ বিক্রির মাধ্যমে আয়ের একটি ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। এর নাম পতিতাবৃত্তি, যা ঘৃণিত অথচ স্বীকৃত পেশা হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত।

মানব চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো রিপু হচ্ছে জৈবিক তাড়না। এর শক্তি আবার প্রচণ্ড। বিভিন্ন পরিবেশ তা বাড়ে কমে। স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ সমাজ স্বীকৃত পথে যখন মানুষ যৌনক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না, তখনই সে অবৈধ পথে তা মেটাবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ পুরুষ যখন যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য স্ত্রী ব্যতিরেকে অবৈধভাবে অন্য নারীর সঙ্গ কামনা করে, অন্যদিকে নারী তার অন্নবস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনে তার দেহ দান করতে প্রস্তুত হয় তখনই আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক একটা অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটা হলো পতিতাবৃত্তির পেশাগত রূপ। এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

পতিতাবৃত্তির উদ্ভব ও বিবর্তন

বলা হয়ে থাকে, পতিতাবৃত্তি আদিম পেশা। আদিম বলতে বোঝায়, হয় সহজাত অথবা সৃষ্টির শুরু থেকেই যা চলে আসছে। পতিতা বৃত্তি সহজাতও নয়, আদিমও নয়। মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে, সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই পতিতাবৃত্তি পেশা চলে আসছে এমন কোনো দলিল আমাদের হাতে নেই। বরং পরিপূর্ণ স্বীকৃত পেশা হিসেবে পতিতাবৃত্তি সমাজ বিবর্তনের বহু পরে শুরু হয়েছে। সে ইতিহাস আমাদের হাতে আছে। এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা বলছে, যৌনাচার সমাজের প্রচলিত ছিল এমন সমাজ আদিতে দেখা যায় না।

তবে প্রাচীন ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় অদ্ভুত সব সামাজিক রীতিনীতির কারণে মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুভোগ্য হতে হতো। পেশাগত কারণে একে সরাসরি পতিতাবৃত্তি বলা যাবে না। তবে এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে অনেক মেয়ে পরবর্তীকালে পরিত্যক্তা হয়ে দেহদান করে অর্থ আয় করতো। এটাকেও সরাসরি সংগঠিত আকারের আধুনিক গণিকা ব্যবসার মতো বলা যাবে না। তা ছিল নিতান্ত অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্ত। এরা ছিল সামাজিক কুপ্রথার স্বীকার। এ ব্যবস্থাটিও আদিম নয়।

সভ্যতার যাত্রা পথে বহু বহু বছর পরে, ভারতের বৈদিক যুগে পতিতাবৃত্তি প্রচলিত ছিল

www.pathagar.com

[illegible] কোনো জোরো অনির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুস্তকে জানা যায়। এ ব্যাপারে [illegible] বর্তমান যুগের মতো নয়। প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং [illegible] ফলেই এসব পতিতাবৃত্তির উদ্ভব ঘটতো। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগে পতিতাবৃত্তি সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় বলে জানা যায়। তৎকালীন [illegible] সমাজের নোংরা আচার ব্যবস্থার কারণে নারী জাতি নিপীড়িত লাঞ্ছিত হতো, [illegible] হতো [illegible] বিভিন্নভাবে নানা নিয়ম নিষ্ঠার ছদ্মাবরণে। ফলে এদের এক অংশের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া গতি থাকতো না। এরকম অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন [illegible] গ্রন্থে। যে অত্যাচার ও নারী নির্যাতনের প্রকৃতি বহু বিচিত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গণিকার উল্লেখ করা হয়েছে রাজসভার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। প্রধান গণিকাসহ বেশ কিছু গণিকা নিয়োগ করা হতো, যারা রাজার বিভিন্ন সেবাকর্মে ও অঙ্গশায়িনী হবার জন্য প্রস্তুত থাকতো।

রাজদরবারের গণিকা ছাড়াও মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথাটি ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করার দরুন [illegible] আইনসম্মত হয়। তখন থেকেই সুযোগ সন্ধানীরা এই প্রথার সুযোগ নিয়ে ব্যাভিচার শুরু করে। দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা এতো জনপ্রিয় ছিল যে, [illegible] ও [illegible] কেউ কেউ বাইরে থেকে মেয়ে কিনে এনে আবার কেউ বা নিজের কন্যাকে পর্যন্ত মন্দিরে উৎসর্গ করতো। রাজকীয় পুরুষ ও মন্দিরের উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতরা এই সকল নারীকে ভোগ করতো। এদের জন্য ভালোবাসা বা বিয়ে করা ছিল মৃত্যুতুল্য অপরাধ। মন্দির থেকে একবার এরা বহিষ্কৃত হলে পতিতালয় ছাড়া এদের আর কোথাও জায়গা হতো না। এভাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৈদিক যুগে ভারতে পতিতালয়ের অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়।

[illegible] বলে এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যে [illegible] পর্যায়ক্রমে [illegible] একজনের স্ত্রীকে অনেকে ভোগ করতো।

সামন্ত যুগে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ্যাবৃত্তি প্রসার লাভ করে। রাজা মহারাজারা ছাড়াও অমাত্যবর্গ পেশাদারী রমণী নিয়োগ করতো। সে সময় পেশাদারী রমণীদের এতো চাহিদা হয় যে এদের যোগান দেবার জন্য নিয়মিত নারী চালান কেনাবেচার ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণীর পুরুষ জীবিকা হিসেবেই এই ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের কাছে এই ব্যবসায় কেনাবেচার হিসেব দিতে হতো ও কর পরিশোধ করতে হতো। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই ব্যবসা এককালে এতো জোরদার হয়ে ওঠে যে গৃহস্থ রমণীদেরও রেহাই ছিল না। সমুদ্র বাণিজ্যে ভারত থেকে নারী চালান হতো বিদেশে, আবার বিদেশ থেকেও বাছাই করা রমণী আসতো ভারতীয় রাজ দরবারের বৈভব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

এসব কাহিনী ভারতীয় পুরাণ ও ধর্ম সংহিতাসমূহের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এদের ঐতিহাসিক মূল্য পাঠকরাই নির্ধারণ করবেন। এবার এনসাইক্লোপেডিয়ার আলোকে দেখা যাক পতিতাবৃত্তি উদ্ভবের ইতিহাস।

www.pathagar.com

[illegible] গতজন [illegible] যৌনতার [illegible] হতে থাকে। [illegible] কিছু কিছু গায় এটাকে আশ্রয় দেয়। [illegible], [illegible] দাসীরা গোপনে যৌন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। ধীরে ধীরে [illegible] এই ব্যবস্থা স্বীকৃতি লাভ করে।

[illegible] প্রভৃতি উন্নয়নের ফলে নগর গঠিত হয় এবং এই ধরনের নগরের মধ্যে পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। [illegible], ব্যবিলন, রোমে এ ধরনের পতিতাবৃত্তির প্রথম উৎপত্তি।

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় স্বেচ্ছামূলকভাবে গোপনে পতিতাবৃত্তি প্রসার লাভ করে। কিন্তু [illegible] তা আইনগত স্বীকৃতি পায় না। চীনে তাঙ রাজবংশ একটি নির্দিষ্ট [illegible] [illegible] চালু করে। কিন্তু পরবর্তী সাঙ রাজবংশ ক্যাফেতে ও অন্যান্য [illegible] [illegible] কর্মরত মহিলারা ছদ্মবেশে বেশ্যাবৃত্তি করতো তাদেরকে [illegible] শহরে [illegible] [illegible]।

[illegible] আমলেই পৃথিবীতে প্রথম বেশ্যাবৃত্তির পেশার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয় ও কর [illegible] করা হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যাপক নগরায়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে [illegible] বেশ্যাবৃত্তির উন্মেষ ঘটে।

[illegible] এনসাইক্লোপেডিয়ার মতে, নগরায়ন অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার এই [illegible] আধুনিক বেশ্যাবৃত্তি পেশা হিসেবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত [illegible]।

[illegible] উদ্যোগে ১৯৮০ সালে ফরাসী পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা জা ফানতান্দলার [illegible] প্রমাণ করেছেন, বেশ্যাবৃত্তি সভ্যতার প্রাচীনতম পেশা তো নয়ই, এমনকি এই পেশার ধারণা আদি সমাজে ছিল একেবারেই অজানা।

[illegible] এনসাইক্লোপেডিয়া নগরায়ন ও অর্থনৈতিক শোষণকে বেশ্যাবৃত্তির প্রধান কারণ বলেছে। আমরা খতিয়ে দেখবো এর প্রত্যক্ষ কারণসমূহ। প্রবেশ করবো বেশ্যাবৃত্তির অন্তর্নিহিত [illegible] গভীরে।

পতিতাবৃত্তি গ্রহণের কারণসমূহ

[illegible] যে পতিতাবৃত্তির জন্ম দিয়েছে, ঐতিহাসিক পরিক্রমায় সে সত্য জানা গেল। [illegible] গ্রামে যে এ ব্যবসা নেই তা বলা যায় না। শহরের মতো নির্দিষ্ট পল্লীতে স্বীকৃত [illegible] নেই বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে অসহায় নারীরা নির্যাতিতা, ধর্ষিতা হচ্ছে এটা বলার [illegible] না। কখনো অর্থের বা উপঢৌকনের বিনিময়ে গ্রামের অনেক নারী গোপনে [illegible] করে থাকে। এনসাইক্লোপেডিয়ার মতে, আর্থিক শোষণ পতিতাবৃত্তির [illegible] [illegible] এই কারণটি প্রধান এবং সার্বজনীন ও সর্বকালীন। আমরা পতিতাবৃত্তির কারণগুলোকে দু'দিক থেকে মূল্যায়ন করবো।

[illegible] পতিতাবৃত্তি গ্রহণের কারণ

[illegible]: দারিদ্রকে পতিতাবৃত্তির প্রধান কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না। অন্যান্য কারণের সঙ্গে দারিদ্র্যও একটি সহায়ক কারণ মাত্র, প্রধান

www.pathagar.com

[illegible] নয়। অভাবের কারণে কোনো মেয়ে যে স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তি [illegible] গ্রহণ [illegible] করেছে এমন কথা আমাদের জানা নেই। বরং আমরা জানি, যেকোনো [illegible] দেবে তবু সতীত্ব দেবে না। তবে অভাবের সুযোগ নিয়ে দালালরা বিভিন্ন [illegible] মেয়েদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করে। অভাব এখানে সরাসরি কোনো কারণ [illegible] উপলক্ষমাত্র। এদেশে নব্বই শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। কিন্তু [illegible] জানি সারা দেশে সর্বমোট এক লাখ নারী এ পেশায় নিয়োজিত। অতএব [illegible] মিলিয়ন দরিদ্র নারী সমাজের মধ্যে মাত্র এক লাখ মহিলা এই পেশা গ্রহণ করেছে [illegible] সরাসরি দারিদ্র্যপ্রসূত নয়। কোনো অবস্থাতেই দারিদ্র্যকে এই পেশার প্রধান কারণ [illegible] যায় না।

নারী অপহরণ

বরং বলা উচিত দারিদ্র্যের চেয়ে নারী অপহরণই বেশ্যাবৃত্তির প্রত্যক্ষ ও প্রধান কারণ। তবে ব্যাপারটি পারস্পরিক সম্পর্কিত। খুব অল্প সংখ্যক নারীকে সরাসরি অপহরণ [illegible] বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। সরাসরি অপহরণের সংখ্যা খুবই কম। [illegible] ফুসলিয়ে, প্রেমে প্রতারণা করে এবং অন্যান্যভাবে মেয়েদেরকে ফুসলিয়ে পরে [illegible] [illegible] কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। অতএব অন্য যেকোনো [illegible] [illegible] থেকে [illegible], নারী অপহরণ অন্যতম প্রধান কারণ। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষে [illegible] মহিলারা কর্মের সন্ধানে শহরে ভিড় জমায় আর নারী অপহরণকারীদের [illegible] তাদের একটা অংশ শেষাবধি পতিতালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

আশ্রয়হীনতা

আশ্রয়হীনতা বেশ্যাবৃত্তির অপর প্রধান কারণ। আশ্রয়হীনতার মধ্যে পড়ে বিধবা, [illegible] পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা, নদীভাঙ্গা, ঘর পোড়া ইত্যাদি। এই সব আশ্রয়হীনা নারী [illegible] ও আশ্রয়ের সন্ধানে শহরমুখী হয়। আর সেখানে গিয়ে পড়ে নারী [illegible] কবলে। তারপর আশ্রয় হয় অন্ধকার গলিতে। একটি জরিপে দেখা গেছে, পতিতাদের অধিকাংশ এই ধরনের নিরাশ্রয় অবস্থায় শিকার হয়েছে।

নারীদের দিক থেকে পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নেবার জন্য উপর্যুক্ত বিষয়গুলো [illegible] কারণ হিসেবে কাজ করে।

ব্লু ফিল্ম ও পর্ণসাহিত্য

ব্লু ফিল্ম, পর্ণসাহিত্য ও অশ্লীল ম্যাগাজিন এক শ্রেণীর পুরুষের যৌন উত্তেজনার অন্যতম [illegible] কারণ। ব্লু ফিল্ম, অশ্লীল ম্যাগাজিন, তথাকথিত যৌন উত্তেজক গল্প, উপন্যাস এবং বিদেশী যৌন উত্তেজক [illegible] ব্যাপক ছড়াছড়ি এক শ্রেণীর যুবকের [illegible] আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তখন [illegible] অবৈধ নারী সংসর্গ কামনায় [illegible] যেকোনো উপায়ে নারী ধর্ষণের চেষ্টা করে, না পারলে ছোটে পতিতালয়ের [illegible] প্রশ্ন উঠতে পারে, বহু আগে যখন ব্লু ফিল্ম আবিষ্কার হয়নি তখনও তো পতিতালয় [illegible] প্রথমত তখন ব্লু ফিল্ম না থাকলেও পর্ণসাহিত্য, যৌন উত্তেজক পেইন্টিং ও [illegible] অস্তিত্ব ছিল। শত শত বছর আগের উলঙ্গ ভাস্কর্য, নগ্ন নারী চিত্র ও নারী [illegible] মিলনের বহু চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

[illegible] দাড়ি ছাড়াও যৌন উত্তেজক অন্যান্য ব্যাপারগুলোও তখনো ছিল। যেমন, [illegible] ব্যাপারটা তো একেবারেই।

[illegible] ও নৈতিকতার অবক্ষয়

[illegible] থাক, ধর্মহীনতা ও নৈতিকতার অবক্ষয় এই অপকর্মের মূল কারণ। তা [illegible] যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সমভাবে প্রযোজ্য। সূরা [illegible] ৩৫ নং আয়াতে যেনা ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ও চরম শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

তাছাড়া সভ্যতা ও মানবতার দৃষ্টিতে বেশ্যালয়ে গমন জঘন্যতম কাজ। সবচেয়ে নোংরা ও নৈতিকতাহীন কাজ এটি।

[illegible] এবার পরিসংখ্যানে দেখবো কোন কোন কারণে কতো শতাংশ পতিতা এই [illegible] এসেছে। সর্বমোট ২০৫ জনের শতাংশ দেখানো হয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে [illegible] বা প্রত্যক্ষভাবে এ পেশায় এসেছে শতকরা ৫৫.১২ ভাগ নারী। প্রেমিক কর্তৃক [illegible] ও বিক্রি হয়ে এসেছে শতকরা ১৭.০৮। স্বামী কর্তৃক বিক্রি হয়ে এসেছে [illegible] ১.৪৭ শতাংশ। সৎ মা কর্তৃক বিক্রিত ২.৭২ শতাংশ। [illegible] কর্তৃক অপহৃত ও [illegible] ১৪.৮২ শতাংশ। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, ছোটবেলা থেকে এই জগতের [illegible], সিনেমায় নামতে এসে শেষে বাধ্য হয়ে এখানে এসে পড়েছে, চাকরি করতে এসে এখানে ছিটকে পড়েছে এসব কারণে ৮.২৮ শতাংশ। (উৎস : সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকার পতিতালয়)।

[illegible] দেখা যাচ্ছে, আর্থিক কারণে অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে অর্ধেকেরও বেশি [illegible] এই পেশায় এসেছে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি দারিদ্র্যের কারণে সরাসরি [illegible] পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন সংখ্যা অতি নগণ্য।

[illegible] দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর দালাল এদেরকে এই পেশায় নামতে বাধ্য [illegible]। [illegible] বলতে গেলে পুরো ব্যবসাটাই তো আর্থিক কারণপ্রসূত। সবাই অতি [illegible]। অতি নিম্নমানের জীবন নির্বাহ করে এবং সকলেই শেষাবধি অন্নের [illegible] জন্য এই জঘন্য পেশাকে বেছে নিয়েছে, অথবা নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এটাই [illegible]।

[illegible] পরস্পর বিরোধিতা

[illegible] পতিতাবৃত্তির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। বৃটিশ আমলেই [illegible] ও প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ও [illegible] রূপ ধারণ করে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, বৃটিশ সরকারকেই আইন [illegible] হয় তা দমনের জন্য।

১৯৩৩ সালে এ উদ্দেশ্যে দ্য বেঙ্গল সাপ্রেশন অব ইমমর‍্যাল অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে এই আইন হুবহু বহাল করা হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রচলিত সকল পূর্বতন আইন [illegible] বিষয়ক রাষ্ট্রপতির ৪৮ নং আদেশ বলে সকল আইনের সঙ্গে ১৯৩৩ [illegible] আইনটিও বহাল করা হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ লজ (রেভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) সংশোধনীর ফলে কিছু টেকনিক্যাল সংশোধনীসহ উক্ত আইনই গৃহীত হয়। এই আইনের কতিপয় বিরোধী ধারা এখানে তুলে ধরা হলো।

কেউ যদি পতিতালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য নিজের জায়গা বা বাড়ি ব্যবহার করে বা এ উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়, তবে তার শাস্তি দু'বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয়ই। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি পাঁচ বছর জেল অথবা জরিমানা। যে ভাড়া দেয় এবং যে নেয় উভয়েই শাস্তিযোগ্য অপরাধী, ধারা ৪(১)।

এ ব্যাপারে কোর্টে নালিশ করতে পারবে কেবলমাত্র পৌরসভা বা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোনো রেজিস্ট্রার্ড সমাজ সেবামূলক সংগঠন অথবা কথিত পতিতালয়ের আশপাশের তিনের অধিক বাসিন্দা, ধারা ৪(৭)।

প্রশ্ন করা যেতে পারে বাংলাদেশের পতিতাবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত বাড়িগুলো কি মালিকবিহীন পরিত্যক্ত?

এবার অন্য ধারায় আসা যাক। বলা হয়েছে, পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট যদি জানতে পারেন যে, স্কুল, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস, আবাসিক এলাকা প্রমোদ এলাকা অথবা প্রকাশ্য রাস্তার পাশে একটি পতিতালয় আছে, তবে তিনি সরিয়ে নেবার জন্য নোটিশ দেবেন এবং ইন্সপেক্টর অব পুলিশের নিচে কেউ এই তদন্ত করতে পারবেন না, ধারা (৬)। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যায় যে, একই আইনে একটি পেশাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই একই আইনে ওই পেশাকে সরিয়ে নিতে বলা হচ্ছে। ধারা ৪(১) এ পতিতালয় স্থাপন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, অতএব ধারা (৬)-এর প্রশ্ন অবান্তর। আবার ধারা (৬) এর [illegible] পরোক্ষ অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

এবার অন্য ধারায় যাওয়া যাক। পতিতার আয়ের ওপর যদি কেউ নির্ভর করে (সে পুরুষ হোক আর মহিলা হোক) তবে তার শাস্তি তিন বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা আর সে পুরুষ হলে এই শাস্তির সঙ্গে বেত্রাঘাতও করা যেতে পারে। তবে পতিতার আয়ের উপরে তার মা ও সন্তানেরা নির্ভরশীল হলে তাদের কোনো শাস্তি হবে না। কিন্তু তারা পতিতার পতিতাবৃত্তিতে সহযোগিতা করলে বা খদ্দের যোগাড় করে আনলে তাদেরও এই শাস্তি হবে, ধারা ৮(২)।

কেউ যদি ফুসলিয়ে বা জোর করে ধরে নিয়ে কোনো মেয়েকে আটকে রাখে বা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করে, তার শাস্তি তিন বছর জেল, এক হাজার টাকা জরিমানা ও পুরুষের জন্য বেত্রাঘাত, ধারা-১১।

এই আইনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে, শাস্তি করা হয়েছে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য- প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য কোনো শাস্তি নেই। যারা সরাসরি অপরাধী অর্থাৎ পতিতা ও তার গ্রাহক, এদের জন্য কোনো শাস্তি নেই।

দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে, দুই বা ততোধিক মেয়েকে নিয়ে কোথাও পতিতা ব্যবসা পরিচালনা করা হলে তাকে পতিতালয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এই আইনে। নারী

www.pathagar.com

পতিতাদের জন্য এ এক অবারিত সুযোগ। কেউ কোনো মেয়েকে নিয়ে এক রাত এই পতিতালয়ে গেলে কোনো আইনেই তাকে আটকাতে পারবে না। তবে কোনো মেয়ে যদি কোনো প্রকাশ্য স্থানে আকারে ইঙ্গিতেও কোনো খদ্দেরকে ডাকে তবে তার শাস্তি এক মাস জেল অথবা একশ' টাকা জরিমানা, ধারা (৭)।

প্রশ্ন হলো, তবে পতিতাবৃত্তির কি কোনো আইনগত ভিত্তি নেই? আছে।

১৯৭৭ সালের পৌরসভার অধ্যাদেশের ৬০ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তবে কোর্টে তাকে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং পতিতালয় স্থাপিত হবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায়।

প্রশ্ন হলো, যে পেশাকে আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই পেশাকেই আবার পৌরসভা অধ্যাদেশে কি করে রেজিস্ট্রেশন করতে বলে? অর্থাৎ আইনে পতিতালয় স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর পৌরসভা অধ্যাদেশ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পতিতালয় স্থাপন করতে বলেছে। দেশের যৌন আইনের আলোকে এই পেশার আইনগত ভিত্তি খুঁজে দেখা যেতে পারে। দেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের যেকোনো নাগরিকের যেকোনো পেশা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংবিধানের কোথাও পতিতাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং একজন পতিতার পেশা হিসেবে বেশ্যাবৃত্তিকে গ্রহণ করার অধিকার দেশের সংবিধানে স্বীকৃত তার মৌলিক অধিকার। প্রশ্ন হলো, স্বেচ্ছায় ক'জন মেয়ে এই পেশাকে গ্রহণ করে তার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। আসলে নারী অপহরণ, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ফলে শেষাবধি এই পেশায় মেয়েরা নামতে বাধ্য হয়। অনেকক্ষেত্রে সরাসরি নারী অপহরণ করে এখানে এনে তাদের বিক্রি করা হয়। তাই সব দেশের নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ ও নারী ধর্ষণ পতিতাবৃত্তির অন্যতম কারণ। এ সম্পর্কে আইনে কি বলে দেখা যায়।

১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের কতিপয় ধারা : কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কোনো মেয়েকে অপহরণ করলে তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে দশ বছর জেল ও জরিমানা। ধারা, ৩৬৬, অবৈধ যৌন সঙ্গমের উদ্দেশ্যে কোনো নাবালিকা মেয়েকে বিদেশ থেকে আনলে দশ বছর কারাদণ্ড। ধারা ৩৬৬ (এ), ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন নির্বাসন অথবা দশ বছর জেল ও জরিমানা। নিজের স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণে দু'বছর জেল। দু'জন বিবাহিত নরনারী পারস্পরিক সম্মতিতেও অবৈধ যৌন সংসর্গে মিলিত হলে শুধু পুরুষটির পাঁচ বছরের জেল হবে, স্ত্রীর কোনো সাজা হবে না। অবিবাহিত ছেলেমেয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তার জন্য কোনো শাস্তি এই আইনে বরাদ্দ করা হয়নি। তবে ছেলেটি যদি মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বা বিয়ের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে শ্লীলতাহানি করে এমতাবস্থায় মেয়েটির সম্মতি থাকলেও ছেলেটির দশ বছরের জেল হবে, ধারা ৪৯৩। এই আইনটিকে সংশোধন করে এরশাদ সরকার ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতনের নিবৃত্তমূলক শাস্তি অধ্যাদেশ জারী করেন। এই অধ্যাদেশে নারী অপহরণ, নারী ধর্ষণ, এ্যাডালটারি এবং নারী নিয়ে ব্যবসা করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কোনো ক্ষেত্রে আইন থাকলেও কঠোর হচ্ছে না অপরাধ, [illegible] বেড়ে যাচ্ছে। এর সত্যিকার কারণ হচ্ছে আইনে সত্যিকার [illegible] রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের অবহেলা।

সমাধানের উপায়

১৯৭০ সালের ৪ঠা মে তারিখে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশুদের ব্যবস্থায় এক স্থান থেকে স্থানান্তরে নেয়া নিষিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি সাপ্রেশন অব দি ট্রাফিক ইন ওম্যান অ্যান্ড চিলড্রেন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কনভেনশনে অংশ গ্রহণকারী সদস্যরা কতিপয় দাবি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীকালে লিগ অব নেশন্স এর দ্বিতীয় অধিবেশন সেগুলো অনুমোদন করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে কোনো দেশই বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে না। পৃথিবীর অনেক দেশেই বেশ্যাবৃত্তি নেই। আমরা বিশ্বাস করি পতিতা পেশার কারণগুলো দূর করতে পারলেই এর সমাধান আপনিই হয়ে যাবে।

চাহিদা থাকলেই তার সরবরাহও থাকবে। চাহিদা বন্ধ হলে তার যোগানও আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই চাহিদা বন্ধ না করে যোগান বন্ধ করা কোনোদিনও [illegible] কিছু সংখ্যক পুরুষের অবৈধ যৌন আকাঙ্ক্ষা বন্ধ করতে হবে। অনেকে বলেন এটাতো জৈবিক তাড়না, স্বাভাবিক প্রকৃতিগত দাবী। আমরাও স্বীকার করি, প্রকৃতিগত স্বাভাবিক দাবি আছে বলেই তো রয়েছে বিয়ের ব্যবস্থা।

মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী রিপু আল্লাহ দিয়েছেন এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তিনিই দিয়েছেন। যদি তা না হতো তবে মানুষ নিজেরই মা-বোনের ওপর আক্রমণ করে বসতো। যখন কেউ তা না করে বেশ্যালয়ে যায়, বুঝতে হবে সেখানেও একটা বিবেক কাজ করছে। কোনো দুরাচার অন্যের মেয়ের ওপর আক্রমণ করে ঠিকই কিন্তু যখন নিজের মেয়ের উপর অনুরূপ আক্রমণ হয় তখনই সে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। এগুলো বিবেকেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এদের ক্ষেত্রে শুধু পাত্র পাত্রীর [illegible] বোধ নেই। বিবেকের বোধ এদের পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তম সমাজের পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত করতে পারলেই আমাদের বিশ্বাস, এই জঘন্য পেশা বন্ধ করা অনেক সহজ হবে। পতিতাবৃত্তির চিরতরে নির্মূল করতে আমরা দু'ধরনের কর্মসূচীর প্রস্তাব রাখছি। প্রথমত, আশু কর্মসূচী আর দ্বিতীয়ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী। আশু কর্মসূচীর ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে :

যৌন উদ্রেককারী সকল উপাদান যেমন ব্লুফিল্ম, পর্ণ ম্যাগাজিন, অশ্লীল সাহিত্য, মেয়েদের নগ্ন ছবি, অশ্লীল সিনেমা বিজ্ঞাপন ও নাচ, নাটক, সিনেমা এমনকি রাস্তাঘাটে মেয়েদের অহেতুক শরীর প্রদর্শন ও আটসাট পোশাক পরিধান, মদ এবং অন্যান্য যৌন উত্তেজক উপাদান আইন করে কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

দুই. যারা অবৈধ নারী সংসর্গ কামনা করবে অথবা বেশ্যালয়ে যাবে তাদের জন্য প্রকাশ্যে লজ্জাজনক শাস্তির বিধান করতে হবে। পতিতালয়ে গমন কিংবা বা যে কোনো উপায়ে নারীদেহ ভোগের প্রচেষ্টা যেকোনো ধরনের যৌন অপরাধ বা বিকৃতি, [illegible]

www.pathagar.com

[illegible]

তিন. নারী অসদাচরণকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে এবং পতিতাবৃত্তির উৎসসমূহ যেমন- নারী অপহরণ, নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, নারীকে [illegible] কাজে নিয়োজিত করা, আর্থিক দৈন্যের সুযোগ অথবা বিয়ের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের এই কাজে নিয়োগ করা অথবা বিক্রি করা, নারীর দেহ ব্যবসার আয়ে ভাগ বসানো- এক কথায় নারী ব্যবসার তৃতীয় পক্ষের জন্যই এই মুহূর্তেই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান করে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এই তৃতীয় পক্ষই সত্যিকার অপরাধী। তাই এদের জন্য একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য শাস্তি।

[illegible] দেখা গেছে লক্ষাধিক পূর্ণ পেশাজীবী পতিতা ও আরো কয়েক লাখ [illegible] পেছনে মোট পঁচিশ হাজারের মতো এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী রয়েছে। এরাই সমাজের প্রকৃত জঞ্জাল। এরাই পতিতাবৃত্তির ভিত্তি। এই ভিত্তিকে শেকড় সমেত উপড়ে ফেলতে হবে।

চার. আমাদের ৪র্থ আশু কর্মসূচিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে বেশ্যাবৃত্তিকে বে-আইনী ঘোষণা করে এ জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কোনো নারী তার নিজ দেহ বিক্রি করতে পারবে না, যেমন নিজের প্রাণ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেবার (আত্মহত্যা) অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। ব্যক্তির প্রাণের ওপর তার পূর্ণ এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও যেমন সে তা হনন করতে পারে না, নারীর দেহের ওপর পূর্ণ অধিকার থাকলেও তা সে বেচতে পারে না। কারণ তা সমাজের সুস্থতা ব্যাহত করবে, এজন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে, প্রয়োজনে সংবিধানে সংশোধনী ধারা জুড়ে দিতে হবে।

অন্যদিকে বর্তমান প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের পতিতালয়গুলো উচ্ছেদ করতে হবে। [illegible] ধরনের দেহ ব্যবসার মূলোৎপাটন করতে হবে। অবশ্যই একদিকে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ আর একদিকে পুনর্বাসন- একই সঙ্গে চলবে।

[illegible] ও পুনর্বাসন কর্মসূচী সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ

সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পতিতাদের আলাদা আলাদা [illegible] সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১. যারা গ্রামে বা আত্মীয়দের কাছে ফিরে যেতে চায়, তাদেরকে আত্মীয়দের কাছে [illegible] বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে আসার দায়িত্ব এই দপ্তর পালন করবে। এই কাজে অন্যান্য সমাজ [illegible] সংগঠনও এগিয়ে আসবে।

[illegible] সঙ্গে তার থাকার পরিবেশ আছে কিনা তাও দেখতে হবে। যদি মর্যাদার সঙ্গে সেখানে থাকার মতো ব্যবস্থা না থাকে, তবে তাকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে।

২. যাদের কোথাও কোনো আশ্রয় নেই অথবা করা যাবে না, তাদের জন্য স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের মতো বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতা তো আমাদের সামনেই রয়েছে। এই সব আশ্রয় কেন্দ্রে গড়ে

www.pathagar.com

কুটিরশিল্পের শিল্প ও হস্তশিল্প। প্রথমাবস্থায় সরকারকে এদের ব্যয়ভার বহন করতে হলেও পরবর্তীকালে এই শিল্প থেকেই এদের আয়ের সংস্থান হবে।

৩. এ ছাড়াও বিভিন্ন কাজে নিয়োগের জন্য পতিতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ও দেশীয় ঔষধ কোম্পানি ধরনের কোম্পানিগুলোও এগিয়ে এসে এ ব্যাপারে সমঝোতায় আসতে পারে। এসব শিল্পে এদেরকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪. যেসব পতিতাদের বিবাহের সুযোগ করা যায় তাদেরকে সরকারি ব্যয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বিষয়ে কুরআনের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "এবং তোমাদের দাসীগণকে অসতী হতে বাধ্য করো না, যদি তারা সতী থাকতে চায়, এই উদ্দেশ্যে যে তোমরা এভাবে দুনিয়ার কিছু সুখ সম্পদ লাভ করবে। কিন্তু যদি কেউ তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য করে তবে আল্লাহ নিশ্চয় তাদের প্রতি এই জবরদস্তির পরে তাদের জন্য অতিশয় দয়াশীল, অশেষ দয়াময়।" এখানে স্পষ্টভাবে স্বয়ং আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, জবরদস্তিমূলকভাবে যাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের অপরাধ আল্লাহ পাক নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। অতএব এ কাজের জন্য তাদেরকে আমরা কেন পাপী মনে করবো ?

৫. যাদের কোনো বৃত্তি গ্রহণ কিংবা কোথাও যাবার উপায় নেই তাদের সারাজীবন খোরপোষের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অর্থের যোগানের জন্য দেশীয় বা আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, "পুরুষের নীতিবোধের অধঃপতন এবং মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসহায়ত্ব" এই দুটি প্রধান কারণের যোগফলের ওপর ভিত্তি করেই পতিতাবৃত্তির মতো একটি জঘন্য পেশা গড়ে উঠেছে। তাৎক্ষণিক কর্মসূচীর মাধ্যমে পতিতাবৃত্তির আপাতত নিশ্চিহ্ন করলেই সমাজ থেকে এই পেশা চিরতরে মুছে ফেলা যাবে না। আবার তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইবে যতোক্ষণ না এ পেশার উৎসমূল নির্মূল করা যায়।

এজন্য প্রথম কাজ হবে ব্যাপকভাবে সচেতনতা গড়ে তোলা। কিভাবে চরিত্র গঠন করা যাবে তা সমাজতত্ত্ববিদরা চিন্তা করবেন। আমরা এখানে এইটুকু বলতে পারি যে, এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, শিক্ষাকে পুনর্গঠন করতে হবে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে। বিষয়টিকে এভাবে বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে পুনর্গঠন করতে হবে। সাহিত্য-সংস্কৃতি, রেডিও, টেলিভিশনের অঙ্গন থেকে সব ধরনের নৈতিক বিরোধী দৃষ্টিকটু ও অশ্লীল অংশ বাদ দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রকাশনা, যাত্রা, চলচ্চিত্র ও রেডিও টেলিভিশন

www.pathagar.com

[illegible] নারী নির্যাতন বিরোধী কমিটি কর্তৃক সেগুলো করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কমিটিগুলোতে [illegible] সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা।

[illegible] মোটামুটি শিক্ষা প্রদানের পর তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিতে [illegible] হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকতার পুরো ক্ষেত্রটি মেয়েদের [illegible] দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকারকে কাজে নামতে হবে। পরিকল্পনাবিদরাই সবকিছু ঠিক করবেন। সরল কাজগুলো [illegible] দেয়া যেতে পারে। এছাড়া দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা যাতে সামাজিকভাবে [illegible] জীবন যাপন করতে পারে সে ব্যাপারে সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের বিয়ের ব্যাপারে যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে যৌতুকবিরোধী আইন যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তাও দেখতে হবে এবং বিয়ের পরে যাতে তাদের উপর কোনো অত্যাচার না হয়, সেজন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক সরকার একটি করে কমিটি গঠন করা। এই কমিটি এসব সমস্যার মীমাংসা করবেন এবং অত্যাচার প্রতিরোধ করবেন। ইউনিয়ন পরিষদগুলোকেই এই দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। ইউনিয়নে ইউনিয়নে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন থাকবে। এমনকি এ নিয়মও করা যেতে পারে, ইউনিয়নে যেকোনো বিয়েতেই ইউনিয়নের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ইউপি মেম্বার উপস্থিত থাকবেন।

ইউনিয়ন পরিষদ অথবা উক্ত কমিটি ইউনিয়নের ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য [illegible] চেষ্টা চালাবে এবং এ ধরনের ঘটনা সরকারের গোচরে দিয়ে আইন প্রয়োগে সাহায্য করবে। যদি কোনো সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান বা মেম্বার বিষয়টি সরকারকে অবহিত না করেন তবে তাকেও দায়ী করা হবে।

এসব বিধি-নিষেধের ফলে নি:সন্দেহে নারী নির্যাতন কমে আসবে, আসতে বাধ্য। এরপরেও অনেক ফাঁক-ফোকর থেকে যাবে, তা দমনের জন্য বা প্রতিরোধের জন্য [illegible] আরো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। মূল কথা হলো, নারী নির্যাতনের সকল সম্ভাবনার [illegible] বন্ধ করতে হবে।

নদী ভাঙনে, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেসব পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পড়ে, সেসব পরিবারের মহিলাদের শহরমুখী হবার প্রবণতা বন্ধ করার উদ্যোগ হিসেবে সেখানেই পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে। কারণ, এই মহিলাদের অনেকেই পরবর্তীকালে ছিটকে পড়ে পতিতালয়ে। এ দেশের নব্বই শতাংশ মানুষ দরিদ্র। দারিদ্র্যকে [illegible] কারণ বলে আমরা মেনে নিতে বাধ্য নই। মূলত দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নারীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়, যার পরিণতি পতিতালয়ে আশ্রয় অথবা আত্মহত্যা। নির্যাতনের শিকার হয়ে নারীরা আত্মহত্যার বিকল্প হিসেবেই একমাত্র এই পেশাকেই বেছে নেয়। তাও স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে।

[illegible] বলা হয়ে থাকে, পতিতালয় বন্ধ করে দিলে সমাজে অনাচার বৃদ্ধি পাবে। আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, পতিতালয়ের অস্তিত্বই সমাজে অনাচার বৃদ্ধির কারণ। [illegible], পতিতালয় না থাকলে নারী অপহরণ কমে আসবে ও যেসব কারণে এখানে

www.pathagar.com

মেয়েদেরকে বিক্রি করা হয়, সে পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। [illegible] গমনের অবারিত সুযোগই সামান্য যৌন উত্তেজনা মানুষকে বেশ্যালয়ে [illegible] করে। তৃতীয়ত, [illegible] সংসার [illegible] লোকেরা [illegible] আসবে। পতিতালয়ের যৌন সুযোগ আছে বলেই কিছু লোক সামান্য কারণে [illegible] অবহেলা করে বেশ্যালয়ে গিয়ে হাজির হয়। এতে পারিবারিক সমঝোতার সুযোগ [illegible] কম। যদি এ সুযোগ না থাকতো তবে যৌন তাড়নায় হলেও পুরুষটি স্ত্রীর [illegible] স্বাভাবিক করে ফেলতো। চতুর্থত, পতিতালয় না থাকলে সমাজে যৌন রোগ [illegible] কমে যাবে। গণিকালয়ে একটি মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে জানা যায় পতিতাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন গণোরিয়া ও শতকরা ২৮ জন সিফিলিস রোগে ভুগছে। [illegible] বন্ধ হবার ভয়ে এরা রোগ গোপন করে থাকে। পঞ্চমত, কিছু লোক স্বল্প আয়ের [illegible] বিয়ে না করে যৌন তাড়না নিবারণের জন্য পতিতালয়ে গিয়ে থাকে। সিলেট, [illegible] চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকে পতিতালয় তুলে দেয়া হয়েছে অনেক আগেই। [illegible] একটি শিল্প শহর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অনাচার বাড়েনি। ঢাকায় পতিতালয় [illegible] সত্ত্বেও ঢাকার চাইতে চট্টগ্রামে যে যৌন অনাচার বেশি এমন কথা কেউ বলতে পারে না। আমেরিকা, বৃটেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই পতিতালয় নেই। অধিকাংশ [illegible] দেশগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পতিতালয় নেই। এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত [illegible] সময় এখনই।

www.pathagar.com

নারী অপহরণ ও পতিতাবৃত্তি

গত ১০ বছর যাবত যে সব অপহৃত মেয়ে ও নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কাহিনী পর্যালোচনা করা হলে দেখা যায় তাদের প্রায় সবাইকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করার জন্য অপহরণ করা হয়েছিল। এর পূর্বেও তা সত্য ছিল তা ধরেই নেয়া যায়। ১৯৭৯ সালে কান্দুপট্টি হতে ৩০ জন কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। এ সংক্রান্ত খবরে উল্লেখ করা হয়:

"কখনও চাকুরী দেয়ার নামে, কখনও বাসার কাজ দেয়ার নামে, কখনও বা বিদেশে লোকের প্রয়োজন দেখাইয়া দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নিরপরাধ কিশোরীদের পতিতালয়ে লইয়া যাওয়া ও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ গত শুক্রবার আকস্মিকভাবে ঢাকার কান্দুপট্টি পতিতালয়ে অভিযান চালাইয়া এই ধরনের ৩০ জন কিশোরীকে উদ্ধার করে। পুলিশের মতে তাহাদের বয়স ৯ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে" (ইত্তেফাক, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯)।

ইত্তেফাকে প্রকাশিত "রাজধানীতে কিশোরী অপহরণের জাল" রিপোর্টের উল্লেখ করা হয়: "আইনে নিষিদ্ধ বয়সের মেয়েদের এ পেশায় আনিবার জন্য ঢাকা শহর জুড়িয়া বিস্তৃত হইয়া পড়া কিশোরী হরণের একটি জাল সক্রিয় রহিয়াছে। আঠারো বৎসর বয়সের কম বয়সী নাবালিকাদের সাবালিকা দেখাইয়া ছাপমোহর মারা এফিডেভিট অনায়াসেই যোগাড় করিয়া দিবার একটি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কায়েম হইয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নাধীন মেয়ের উপস্থিতি ছাড়াই এ ধরনের কাগজপত্র তৈরি হইতেছে বলিয়া অভিযোগ আছে। যে চারজন কিশোরীকে (টানবাজার) পতিতালয়ের বন্দীদশা হইতে পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে তাহাদের নামে আদায়কৃত সম্মতি ঘোষণার হলফনামা এবং উহাদের বয়সের সহিত বন্দীত্ব হইতে উদ্ধার লাভের বাসনা ও প্রকৃত বয়সের কোনো মিল নাই। দেহ ব্যবসাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পদক্ষেপের মধ্যে সীমিত রাখার জন্য আইনে হলফনামার যে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল, হরণের পর ভীতির মুখে কৃত্রিম পন্থায় আইনের সে বেড়া ভাঙ্গিবার প্রথা ব্যাপক হইয়া উঠায় এক্ষণে উহার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, এ অভিমত অভিজ্ঞ মহলের। ... ঢাকা শহরময় মেয়ে ধরার জাল বিস্তৃত হইয়াছে। নরসিংদীর জরিনা শবমেহেরকে এ জালের বাবুরাইল ঘাঁটিতে পৌছাইয়া দেয়। খুলনার মেয়ে জোৎস্না কাজের সন্ধানে ঢাকা স্টেশনে পা দিয়া ইহাদের চক্রের খপ্পরে পড়ে। লাকসামের মেয়ে অঞ্জনা বাড়ি ফিরিবার জন্য গাড়ি ধরিবার জন্য সন্ধ্যাকালে ইহাদের খপ্পরে পড়ে ঢাকায়। হাস্না ভাল বাসায় কাজের সন্ধানে মিরপুর ছাড়িয়া যাহাদের খপ্পরে পড়ে তাহারা তাহাকে টানবাজারে চালান দেয়। টংগী বাড়ির কয়েকটি মেয়ে বাস স্টপেজে এক ছোকড়া দালালের মারফত জিমখানা মাটিতে প্রেরিত হয়। সেখান হইতে চালান হয় টানবাজারে" (ইত্তেফাক, ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৫ইং)।

www.pathagar.com

...মার্চ ১৯৮৮ সালের ইত্তেফাকের খবর: বিভিন্ন গ্রন্থে... ভারত ও পাকিস্তানে নারী পাচারের এক কাহিনী প্রকাশিত হয়। এ সব পাচারকৃত নারীর দুর্দশার কথা ইত্তেফাকে ৪-৫-৮৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ সব পাচারকৃত নারীর মধ্যে যারা বিভিন্ন দেশে জেলে আটক আছেন তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার বলে উল্লেখ করা হয় (দৈনিক সংগ্রাম, ১-৩-৮৮)।

জবরদস্তি করে নারী অপহরণ ও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের অসংখ্য খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের ৬-৪-৮৯ তারিখে প্রকাশিত খবরে উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়, "এক জরিপ রিপোর্ট হতে জানা যায় যে পতিতালয়ে দশ বছরের কম বয়সের মেয়ের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ।... এক শ্রেণীর নোটারী পাবলিক আছেন যারা বয়স যাচাই না করেই এফিডেভিট করেছেন। এভাবেই অল্প বয়সী মেয়েদের পতিতার খাতায় নাম লেখানো হয়"। ১০-৪-৮৯ তারিখের ইত্তেফাকে পুনরায় খবর প্রকাশিত হয় "টঙ্গী ও বন্দর উপজেলায় নারী পাচারকারীদের আখড়া"। খবরে বলা হয় "একদল সংঘবদ্ধ নারী পাচারকারী দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে কিশোরী ও যুবতীদের অপহরণ করিয়া প্রথমে নিদিষ্ট আস্তানায় পৌঁছায়। সেখান হইতে আত্মরক্ষার বলে আনিয়া নিষিদ্ধ পল্লীতে অথবা সীমান্তের ওপারে পাচার করা হয়"। এ প্রসঙ্গে ৪-৬-৮৯ তারিখে দৈনিক সংগ্রামের একটি খবর বিশেষ উল্লেখযোগ্য যা নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

"উদ্ধারকৃত নূর নাহারকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ। টানবাজার পতিতালয়ে দীর্ঘ ২৭ দিন বন্দী থাকার পর পুলিশ কিশোরী নূর নাহারকে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে গত ২৮শে মে উদ্ধার করেছে।

পুলিশ নূর নাহারকে পতিতালয়ে বিক্রির অভিযোগে নারী পাচারকারী ... আনোয়ার হোসেন ... এবং যার কাছে নূর নাহারকে বিক্রি করা হয়েছিল সেই পতিতা সর্দারনী ফরিদাকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

নারায়ণগঞ্জ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ফজলে এলাহী নূর নাহারকে নারায়ণগঞ্জ জেলের 'সেফ কাস্টডিতে' প্রেরণ করেন।

ইতিমধ্যে মামলার তদন্তকারী দারোগা টানবাজার পতিতালয়ে কিশোরী মেয়ে বিক্রির অভিযোগে ঢাকার মিরপুর থেকে পাঁচজন সংঘবদ্ধ নারী পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন। টানবাজারের প্রভাবশালী পতিতা সর্দারণী ফরিদা গ্রেফতারের পর পতিতালয়ের সর্দারনীরা যে কোনো মূল্যে ফরিদাকে মুক্ত করার জন্য চক্রান্তের জাল বুনতে থাকে। এই চক্রান্তের অংশ হিসেবে একজন নামকরা উকিলের দ্বারা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে নূর নাহারের অপহরণ ও দেহ ব্যবসায় জোর পূর্বক নিয়োজিত করার জন্য পুলিশের মামলাটি যেন খারিজ হয়ে যায় এবং ফরিদা যাতে খালাস পায় সেই জন্য নূর নাহারকে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া পূর্ব স্বীকারোক্তি বাতিলের আবেদন সম্বলিত একটি ভূয়া জবানবন্দী আজ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করে।

কিন্তু উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিষয়টি সন্দেহ হলে তিনি নূর নাহারকে তাঁর খাস কামরায় নিয়ে জবানবন্দী প্রত্যাহারের কথা বললে নূর নাহার বলে, "আমি কোন

www.pathagar.com

[illegible] করেন। তিনি এর কিছুই জানেন না। আদালতে জেলার সাহেব (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ) বলেন যে, নূর নাহারকে জোর করে ছেড়ে দেবে, এই কাগজে সই দাও। তখন আমি সই দেই। উল্লেখ্য [illegible] যে, আজই নূর নাহারকে জেল হেফাজত থেকে তাঁর বোন জামেলা [illegible]র কাছে দিয়ে দেয়ার তারিখ। এই সুবাদে পতিতা সর্দারণী ফরিদা সাব-জেলারকে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে অসহায় নূর নাহারের কাছ থেকে সই গ্রহণ করে। কিন্তু বিষয়টি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে আসে।

উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার নাগরীসাগরী গ্রামে নাহারদের বাড়ি। ওর পিতা গ্রামের মসজিদের ইমাম। নাহার দিনাজপুর থেকে বোনের বাসায় আসার পথে অপহৃত হয়" (দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা জুন, ১৯৮৯)।

এ ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা জরুরি হয়ে পড়েছে। যেহেতু পতিতালয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য এ সব কিশোরী ও নারীদের অপহরণ করা হয় এবং যেহেতু জোরপূর্বক কিশোরী ও নারীদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে তাই প্রথমে পতিতালয় অবিলম্বে বন্ধ করা একান্তই জরুরি। তা করা হলে নারী অপহরণের প্রধান কারণই বন্ধ হয়ে যাবে। অভাবের কারণে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করা হয় একথা উদ্ধারকৃত মেয়েদের বিবৃতি হতে একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দেখা গেছে যে, সব মেয়েকেই জোরপূর্বক তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। অভাবের কারণে মেয়েরা ভিক্ষা করতে পারে কিন্তু পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে না। অবশ্য পতিতালয় বন্ধ করার সাথে পতিতাদের পুনর্বাসিত করতে হবে। এজন্য সরকারকে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পতিতাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য ১৯৩৩ সালের পতিতাবৃত্তি বিরোধী আইনকে কার্যকরী করতে হবে। আইনের ফাঁক-ফোঁকড় বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে নতুন আইন তৈরি করতে হবে। এফিডেভিটের বর্তমান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। অল্প বয়স্ক নারীকে যারা এফিডেভিটের মাধ্যমে সাবালক করায় তাদেরকে ১৪ বৎসর জেল দেয়া প্রয়োজন। এফিডেভিট প্রদান সংক্রান্ত নথি পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

পতিতালয় না থাকলে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ ও অনুমোদিত লক্ষ লক্ষ পতিতা থাকা সত্ত্বেও সে দেশে ১৯৮৪ সনে ১ লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হয় (অবজারভার ২৯-৭-৮৫)। ধর্ষণের মূল কারণ পতিতা না থাকা নয় বরং অশ্লীলতার বিস্তার। অবশ্য সব সমাজেই বদমায়েশদের দ্বারা কিছু ধর্ষণ হয়। তাদের শাস্তির বিধান করতে হবে। কিন্তু ধর্ষণের ভয়ে পতিতালয় খোলা রেখে লক্ষ লক্ষ মেয়ের সর্বনাশের পথ খোলা রাখা যেতে পারে না। পতিতালয় না থাকলে পতিতারা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। পতিতালয় থাকলেও কিছু পতিতা ছড়িয়ে থাকে। তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে এবং পরে পুনর্বাসিত করতে হবে। কাজেই এ যুক্তিতে পতিতালয় অব্যাহত রাখা যায় না। একথাও মনে রাখতে হবে কুরআন মোতাবেক পতিতাবৃত্তির পেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (সূরা বনী ইসরাইল, সূরা নূর)। অন্যান্য ধর্মেও একই ধরনের নির্দেশ আছে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে নারীর মান-সম্মান রক্ষার্থে এবং নারী অপহরণ বন্ধ করার মানসে পতিতালয় বন্ধসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা গোটা জাতির অবশ্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

পতিতাবৃত্তি কারণ ও সমস্যা

আমাদের দেশে অন্যান্য স্থানের মতো মংলাতেও বার-বনিতাদের এক বড় [illegible] আছে। এদের খদ্দের হচ্ছে স্থানীয় লোকজন ও বিদেশী জাহাজের নাবিকরা। [illegible] ক্রমে সারাদেশেই অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার হচ্ছে। সারাদেশের অধিকাংশ [illegible] বোধ হয় বারবনিতাদের ছোট বা বড় আস্তানা গড়ে উঠেছে। এ জন্য এ সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। তবে গোড়ার দিকে যাবার আগে সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আরেকটু আলোকপাত করা দরকার।

সমস্যাটি পুরাতন তবে আমার মনে হয়, বৃটিশরা আসার আগে পতিতাবৃত্তি [illegible] সরকার মঞ্জুরীপ্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা সংঘবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেনি। বৃটিশ আমলে পতিতাবৃত্তি বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তদানীন্তন শাসক [illegible] জমিদার ও ভূ-স্বামী শ্রেণী ছিল এই পতিতাবৃত্তির জন্মদাতা। এদেশের মানুষের [illegible] বিকৃতি সাধন ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। বৃটিশ শাসনের পর নতুন করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার শুভলগ্নে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটে। কিন্তু শহরের আনাচেকানাচে বৃটিশ শাসক চক্রের অধঃস্তন এদেশীয় শাসকরা পতিতাবৃত্তির কলঙ্ক স্পট নানা অজুহাতে আগলে রাখে। উত্তরকালে ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত শিক্ষার [illegible] হিসেবে বিজাতীয় অর্থ ব্যবস্থার বদৌলতে জনগণের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ও [illegible] নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়। এসবকেই মূলধন করে শহরের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা পতিতাবৃত্তি আজ [illegible] আজ গোটা দেশে প্রায় ১ লাখ হতভাগ্য নারী পতিতাবৃত্তিতে [illegible] এর মধ্যে ১ হাজার দুশ পঞ্চাশ জন মেয়ে শুধু ঢাকার তিনটি পতিতালয়ে অসহনীয় জীবন যাপন করছে। অবশিষ্ট সংখ্যক পতিতা বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা [illegible] ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এসব হতভাগ্য মেয়ে তাদের অবস্থারই এক অসহায় শিকার। স্বেচ্ছায় হয়তো কেউ এ পথে আসতে পারে, কিন্তু তাদের সংখ্যা দু'চার জনের বেশি হবে না। অধিকাংশই [illegible] এসেছে বাধ্য হয়ে। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় পতিতাদের শতকরা ৫৫ [illegible] ও ১৭ ভাগ এসেছে প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত ও বিক্রিত হয়ে। শতকরা ২ ভাগ এসেছে স্বামী, শতকরা ৩ ভাগ এসেছে সৎ মা এবং শতকরা ১৫ ভাগ এসেছে [illegible] কর্তৃক বিক্রিত হয়ে। অবশিষ্ট ৯ ভাগের মতো পতিতা এসেছে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে অথবা সিনেমায় নামতে এসে বা চাকরির খোঁজ করতে এসে বিপাকে পড়ে। উপরোক্ত কারণগুলোর মূলে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজনিত পরিবেশ পরিস্থিতিই [illegible] ক্ষেত্রে সক্রিয়। এই দারিদ্র্যের কারণ অনেক। দেশে সরকার আছে বটে কিন্তু [illegible] বিত্তহীন ও সহায়হীনদের অভিভাবকত্ব করার কেউ নেই। ফলে বিত্তহীন ও [illegible] মেয়েদের অনেকে দুশ্চরিত্র লোকের শিকারে পরিণত হয়ে অবশেষে [illegible] নিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

নদী শিকস্তির কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে অন্তত ১ লাখ লোক পথে দাঁড়াচ্ছে। এদের মধ্যে ৫০ হাজার শিশু ও যুবতী নারী। এই নদী শিকস্তি লোকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তারা শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। এদেরকে রাস্তাঘাটে থাকতে হয়। এসব সহায় সম্বলহীন গরীবরা শেষ পর্যন্ত নারী ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে। তাছাড়া বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সবগুলোতেই জনৈক সমীক্ষকের ভাষায় মানুষের দাম কমে গেছে, মেয়ে মানুষের দাম কমেছে আরও বেশি। দেখা গেছে, একটি রুটির বিনিময়ে একটি মেয়ে স্বাভাবিক জীবন ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ এর একটা দৃষ্টান্ত। এই দুর্ভিক্ষের সময় দেখা গেছে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন অনাহারী পরিবারগুলোর মেয়েরা দুশ্চরিত্র ও টাউট লোকদের কবলে পড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। লঙ্গরখানায় রুটি দুধ দেয়ার নাম করে অনাহারী মেয়েদের সর্বনাশ করা হয়েছে। এসব মেয়েদের পক্ষে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরাই পরে পতিতালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

অতএব এই কারণ দূর না করে পতিতাবৃত্তি বিলুপ্তির কোনো উপায় নেই। অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। দেশের নৈতিকতাকে রক্ষা করতে হলে সমস্যার গোড়ায় হাত দিতে হবে এবং নারীদের পুনর্বাসনে এক মহাপরিকল্পনা নিতে হবে। যেখানে প্রতিটি বড় শহরে এমনকি ছোট শহরেও ছিন্নমূল নারীরা হাজারো সংখ্যায় রাস্তায় বসবাস করে, সেখানে কি করে এ সমস্যা সরকারের প্লানিং কমিশন, পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না তা ভাবতেও অবাক লাগে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য মহাপরিকল্পনা নিতে হবে, শুরু করতে হবে নদী শিকস্তি সমস্যা থেকে। আমরা যেহেতু জানি যে, প্রতি বছর লক্ষাধিক লোক নদী ভাঙনের শিকার হয়ে থাকে, সেহেতু এ সমস্যার মোকাবিলায় জন্য আমাদের স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে এ জন্য পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যে সব এলাকায় সাধারণত নদী ভাঙন হয় তার আশেপাশে এসব লোকদের সাময়িক আশ্রয়দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসেপশন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার দরকার হবে। একই সঙ্গে ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় তাদের বিভিন্ন চরাঞ্চলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে। অন্যপক্ষে ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা রাখতে হবে যে, পরবর্তী নদী ভাঙনের শিকার লোকদের কোনো চরে বা বাসযোগ্য জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন পুনর্বাসিত এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষির সুবিধা সৃষ্টির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কাজেই উপরে উল্লিখিত কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় কমিটিকেও কাজ করতে হবে। যদি এভাবে নদী শিকস্তিসহ অন্যান্য কারণে প্রতি বছরের জন্য একটি স্থায়ী পুনর্বাসন ব্যবস্থা দেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে শহরাঞ্চলে ছিন্নমূল জনতার ভিড় অনেক কমবে, বিপন্ন মহিলাদের সংখ্যাও কমে আসবে।

এভাবে নদী শিকস্তি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিঃসম্বল ও ঠিকানাহীনদের পুনর্বাসনের সাথে সাথে বর্তমানে যে সব মহিলা অসামাজিক কাজে লিপ্ত আছে, তাদের পুনর্বাসের জন্য আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আগেই বলেছি, এই ধরনের

www.pathagar.com

পতিতা মহিলাদের সংখ্যা এক লাখের বেশি হবে না। এদের মধ্যে যাদেরকে [illegible] ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইউমেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোমে পুনর্বাসিত করতে হবে। এ জন্য অর্থের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। যদি সরকার সমাজকল্যাণ বিভাগ ও শিল্প মন্ত্রণালয় বিশেষ করে কুটির শিল্প কর্পোরেশনের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেন তবে পুনর্বাসিত মহিলাদের [illegible] দিয়ে যে সব দ্রব্যাদি তৈরি করা যায় তার বিক্রিমূল্য হতেই তাদের খরচের একটি বড় অংশ উঠে আসবে। [illegible] যথাযোগ্য উদ্যোগ নিতে হবে। তারপর [illegible] কাজে নিয়োগ করাও সম্ভব হবে। নানা ধরনের শিল্পে ট্রেনিং পাওয়ার পর তাদের অধিকাংশই স্বাধীন জীবন বেছে নিতে পারবে। তারপরেও যারা পারবে না তাদেরকে তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে দেখে যেতে হবে।

এসব পদক্ষেপ ছাড়া জাতীয় জীবনের এই বিরাট ক্ষত, অবক্ষয়, [illegible] কার্যকলাপের এই প্রবণ ও নারীদের [illegible] কিছুতেই দূর করা সম্ভব হবে না। [illegible] ও [illegible], নারী পুনর্বাসন [illegible] পুরুষের পুনর্বাসনের উপর অধিক [illegible] [illegible] থাকলেও যে বিপদ হয় না সে [illegible] মহিলাদের উপর আসে।

পরিশেষে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার। যারা নারীদের অপহরণ করে বা তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত করায় তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রবর্তন করা উচিত। এ জন্য বাংলাদেশ দণ্ড বিধি আইনের [illegible] ৩৬৬, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯৭, ৩৯৮ ও ৫০৯ ধারাকে পুরোপুরি নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আর নারী ব্যবসায়ী ও দালালদের খুঁজে বের করা কঠিন নয়। আমাদের দেশে যে পতিতালয়গুলো রয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫ হাজার দালাল, বাড়ির মালিক, গুণ্ডা ও মাসী কাজ করছে। এদের সহজেই খুঁজে বের করা যায় এবং [illegible] [illegible] কারসাজি দমন করতে পারলে পতিতাবৃত্তি আজ যে কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই কাঠামোকেই ভেঙে দেয়া সম্ভব।

আমাদের বিশ্বাস এসব কোনো কিছুই আমাদের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টির বাইরে নেই। তবে দৃষ্টি থাকলে কিংবা জানা অথবা জানা থাকলেই কোনো উপকার হয় না। চাই কাজ। দুস্থ মহিলাদের স্বার্থে, দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং জাতীয় আদর্শের স্বার্থে আমাদের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত।

www.pathagar.com

পতিতাবৃত্তির সমাধান : একে নিষিদ্ধ করে পুনর্বাসন করতে হবে

অনেকে পতিতাবৃত্তিকে সর্বপ্রাচীন পেশা বলে থাকেন। এটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে ইতিহাসের প্রথম দিকেই কোনো এক পর্যায়ে দেহব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো প্রত্যাদিষ্ট (revealed) ধর্মেই এর স্বীকৃতি নেই। ইহুদী ধর্ম কিংবা খৃস্টবাদ বা ইসলামের কোনোটাতেই এর কোনো স্বীকৃতি নেই। হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মেও [illegible] ধর্মীয় নেতারাও একে ঘৃণা করেন এবং এ অবস্থার অবসান কামনা করেন।

মুসলিম আমলের পর ইংরেজি আমলে উপমহাদেশে এ পেশা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি অনেক স্থানে থানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অধিকাংশ স্থান থেকে স্থানীয় লোকজন পতিতালয় উৎখাত করে এবং কয়েকটি বড় শহরে তা থেকে যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ পতিতালয় থাকাকে কখনো পছন্দ করেনি। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে ধর্মের, বিশেষ করে ইসলামে এর সুস্পষ্ট নিষিদ্ধতা। তাই সব সময় জনগণ এর উৎখাত চেয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো সরকারই এ পেশাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে পতিতাদের পুনর্বাসনের কোনো দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। পাকিস্তান আমলেও নয়, বাংলাদেশ আমলেও নয়। অবশ্য পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার এ পেশাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কোনো অনুমোদিত পতিতালয় সেখানে নেই। তবে গোপন কিছু হলে, সে কথা স্বতন্ত্র। তা যেকোনো ক্ষেত্রে, যেকোনো দেশে হতে পারে।

পতিতাবৃত্তির ফলাফল আমরা সবাই জানি। এরই ফলে একদল নারী (অধিকাংশ শিশু) মানবেতর জীবনযাপন করে। সকল জরিপে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ নারীকে অপহরণ করে বা ফুসলিয়ে অথবা জোর করে অকথ্য নির্যাতনের পর এ পেশাতে আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের জরিপেও তাই দেখা যায়। আমরা সবাই অবগত যে, এসব পতিতালয় থাকার ফলেই নারী অপহরণের এত ব্যাপকতা। সারা বিশ্বে যদি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে পতিতালয় এবং নারী ব্যবসা বন্ধ করা যেত তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে, যেভাবে মেয়েশিশুরা অপহৃত ও পাচার হচ্ছে তা বন্ধ হত। অন্তত দেশেও যদি পতিতালয় বন্ধ হয়, তাহলে নারী অপহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করতে পারলে এবং প্রয়োগ দু'দেশেই যথার্থ হলে বাংলাদেশী নারী ও শিশুদের ভারতে পাচারও বহুলাংশে হ্রাস পেতে পারে।

পতিতাবৃত্তি ছাড়া মানুষ চলতে পারে না– এমন নয়। খিলাফতে রাশেদার সময় এ পেশা ছিল না। উমাইয়া ও আব্বাসী আমলেও তা প্রকাশ্যে ছিল না। উপনিবেশবাদের পূর্বের মুসলিম বিশ্বে এটি থাকলেও গোপনে ছিল এবং খুব সামান্যই ছিল। বর্তমানে ইরান ও

www.pathagar.com

সউদি আরবে পতিতালয় নেই। সুদানেও এ পেশা উৎখাত করা হয়েছে। [illegible] পতিতালয় বর্তমানে নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, [illegible] এ পেশার [illegible] চায় [illegible] এটা মানবতার চূড়ান্ত অবমাননা। এর ফলে বিপুল সংখ্যক লোকের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়।

পতিতালয় [illegible] রাখার পক্ষে নানান যুক্তি দেয়া হয়, যা মূলত সঠিক [illegible] যুক্তি দেয়া হয় যে, তা হলো পেশার অধিকার নষ্ট হবে। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য [illegible] যেমন পেশা নয়, তেমনি দেহ ব্যবসাকে পেশার স্বীকৃতি দেয়া যায় না। পতিতালয়ে না থাকলে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে– এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। পতিতালয় না [illegible] কারণে সউদি আরব বা ইরানে ধর্ষণ ব্যাপক হয়নি। অন্যদিকে পতিতালয় [illegible] কম হবে– এই যুক্তি সঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য পতিতালয় থাকা সত্ত্বেও [illegible] দু'লাখের মত ধর্ষণ হয়। এ ছোট্ট একটি উদাহরণ থেকে প্রমাণ হয়, ধর্ষণের [illegible] পতিতালয় থাকার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। পতিতালয় রেখে যদি ধর্ষণ বন্ধ [illegible] হয়, তা হলে প্রত্যেক শহর ও গ্রামগঞ্জে পতিতালয় স্থাপন করতে হবে। [illegible] [illegible] করতে হয়, তাহলে কি আরো অধিক সংখ্যক [illegible] ও [illegible] হবে না? তবে একথা হতে পারে যে পতিতালয় বন্ধ করায় [illegible] সাময়িকভাবে দু'একটি এলাকায় ধর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এ জন্য সে সময় অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন পড়বে। পতিতাদের বিয়ে দেয়ার [illegible] যেতে পারে, বিশেষ করে তাদের সাথে, যারা তাদের কাছে [illegible] আওরঙ্গজেব এ ব্যবস্থা তার সময় কিছু পতিতার ক্ষেত্রে গ্রহণ [illegible] মহাকবি ইকবাল : ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, পৃঃ ৩৫৭-৮)।

সুতরাং বাংলাদেশ সরকার যদি এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান চান, তাহলে [illegible] [illegible] না করে আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] মধ্যে একটি সার্ভে করতে পারেন যে, কত পতিতার পুনর্বাসন প্রয়োজন [illegible] তারপর পতিতাবৃত্তিকে সুস্পষ্ট আইন করে নিষিদ্ধ করতে পারেন এবং এ সব পতিতাকে উপরোক্তভাবে বিবাহ এবং কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে পারেন। আমাদের বাজেটের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে থেকে কিছু [illegible] পুনর্বাসনে ব্যয় করা মোটেই কষ্ট হবে না। একই সাথে ধর্ষণের জন্য বিচার ও [illegible] [illegible] করতে হবে, প্রয়োজনে বিশেষ কোর্টের মাধ্যমে। তেমনিভাবে দেশের [illegible] [illegible] সঠিক করা প্রয়োজন, যাতে শহরের জনসাধারণ সকলে ছোট বাসা হলেও পেতে পারে। অবশ্য এটা সময়ের ব্যাপার। যাতায়াতের ব্যবস্থাও উন্নত করতে হবে, [illegible] শহরের আশপাশের লোক শহরের বাইরে থেকে সহজে এসে শহরে কাজ করতে পারে, বিশেষ করে প্রধান শহরসমূহে। এর ফলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা কমে [illegible] [illegible] বিবাহকে সহজ করার জন্য সামাজিক প্রচারণা চালাতে হবে এবং [illegible] যারা আর্থিক কারণে বিবাহ করতে পারছে না তাদেরকে কিছুটা সাহায্য করতে [illegible]

অর্থাৎ সামাজিক সুস্থতা ও শান্তি এবং পতিতা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী [illegible] একটি উন্নত পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের আগাতে হবে।

www.pathagar.com

ধর্ষণের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কিছু কথা

[illegible] দেশে সাধারণভাবে অপরাধ এবং বিশেষ করে ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে [illegible] রিপোর্ট থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। দৈনিক ইনকিলাবের ১৮ জুন [illegible] সংখ্যায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের জরিপ [illegible] এপ্রিল ও মে ১৯৯৮ সালে ধর্ষণের সংখ্যা ২১২টি। এর একটি দুঃখজনক [illegible] এ সংখ্যার মধ্যে ৯৩টি গণধর্ষণ।

[illegible] ও ধর্ষণের বৃদ্ধি গোটা জাতিকে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত করেছে। এ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে এ কয়টি সেমিনার ও আলোচনা সভা হয়েছে, তাতে নিম্নোক্ত কারণগুলোকে এ [illegible] [illegible] জন্য প্রধানত দায়ী বলে সনাক্ত করা হয়েছে :

[illegible] আইন শৃঙ্খলার অবনতি, পুলিশ প্রশাসনের অদক্ষতা, ব্যর্থতা ও আইন [illegible] সুবিচার রাখতে না পারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ [illegible] সনাক্ত করতে, ধরতে এবং দ্রুত বিচারে সোপর্দ করতে ব্যর্থ হয়।

[illegible] দীর্ঘসূত্রতা। অধিকাংশ বিচার শেষ করতে অনেক সময় লেগে যায়, [illegible] অপরাধীর শাস্তি প্রদান [illegible] পায়।

[illegible] ধরনের অশ্লীল পণ্য উপাদান, শিল্প ও সাহিত্যের বিস্তার- প্রকৃতপক্ষে দেশে [illegible] উপর সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ নেই যা অবশ্যই [illegible] মানুষকে অসৎ পথে টেনে [illegible]।

[illegible] শিক্ষা ব্যবস্থার শক্ত নৈতিক ভিত্তির অনুপস্থিতি- নানা ইজম-এর আড়ালে শিক্ষা [illegible] অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলত নৈতিক শিক্ষাকে পরিহার করা হয়েছে, যা অপরাধ [illegible] সৃষ্টি করেছে।

[illegible] বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে ঐ সমস্ত সেমিনার ও আলোচনা সভার রিপোর্ট [illegible] এবং এগুলোর মোকাবিলার মধ্যেই এর সমাধান [illegible] বলে মত প্রকাশ করা [illegible]। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এবং কিছু ব্যক্তি তাদের [illegible] পর্দা প্রথাকে পতিতালয় তুলে দেয়াকে ধর্ষণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ [illegible] (দ্রষ্টব্য : Holiday, 22th May সংখ্যার সম্পাদকীয়)। তাদের কেউ কেউ [illegible] পুনর্বহালের দাবী জানিয়েছে।

[illegible] পত্রিকা ও ব্যক্তির এই মতামত যে, পতিতালয় পুনর্বহালই এ [illegible] [illegible] সমাধান তা [illegible] । এটা যে কেবল সকল ধর্মের নৈতিক শিক্ষার বিরোধী [illegible] যুক্তিও [illegible]। উদাহরণত [illegible] কথা বলা যায়, যেখানে বছরে কমপক্ষে ২ লাখের মত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে [illegible] বিভিন্ন রিপোর্টে জানা যায়। অর্থাৎ আমাদের দেশে যেখানে দু মাসে ২১২টি অর্থাৎ

www.pathagar.com

[illegible] এক দেড় হাজারের মতো এ [illegible] দুঃখজনক ঘটনা [illegible], [illegible] ঘটছে দু [illegible] অনুপাতকে [illegible] করে তা দাঁড়ায় [illegible] থেকে ১০৫ গুণ।

অথচ আমরা জানি, যুক্তরাষ্ট্রে পতিতালয়ের শেষ নেই এবং পতিতারও কোনো [illegible] নেই। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, পতিতালয় থাকার সঙ্গে ধর্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই। ভাবতে অবাক লাগে এরকম সমাধান কি করে কেউ প্রস্তাব করতে পারে। [illegible] তাহলে তো বাংলাদেশের অনেক গ্রামেগঞ্জে পতিতালয় স্থাপন করতে হবে। কেননা, [illegible] স্থানেও অনেক সময় ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। আর যদি তাদের কথামত [illegible] সংখ্যক পতিতালয় স্থাপন করতে হয়, তাহলে কি অসংখ্য নারী বিশেষ [illegible] এবং দরিদ্র তারা ছল-চাতুরী, প্রলোভন, অপহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে পতিতালয়ে [illegible] নির্যাতনের শিকার হবে না? এ ধরনের অমানবিক প্রস্তাব দেয়া বিবেকসম্পন্ন [illegible] [illegible] না। ধর্ষণ [illegible] জন্য প্রয়োজন উপরোল্লিখিত কারণসমূহ দূরীকরণ [illegible] বিচার করে শক্ত শাস্তির বিধান।

[illegible] সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Social Engineering) [illegible] যাতে [illegible] বিবাহ করতে পারে এবং পরিবার নিয়ে থাকতে পারে [illegible] দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করা। তাহলে পারিবারিক জীবনের মধ্যেই [illegible] মানুষের জৈবিক পুনর্বাসন হতো। ভবিষ্যতে এ পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করতে হবে এবং এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং জাতীয় পরিকল্পনায় এর উপযুক্ত স্থান [illegible] হবে।

একটি দৈনিক পত্রিকায় সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক [illegible] যে, ইসলামী আইন ধর্ষণ প্রতিরোধে সাহায্য করে না, কেননা সে আইনে ধর্ষণ [illegible] জন্য চারজন চাক্ষুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে, যা পাওয়া খুবই দুষ্কর। [illegible] সাহেবের অভিযোগ এতে এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ষণ উচ্ছেদে কোনো সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না। ইসলামী আইন সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান না থাকার ফলেই তিনি এরূপ বলেছেন। যেখানে আধুনিক আইনে কেবল বিবাহিত নারী পুরুষের পরস্পর যৌন সম্পর্ককে যেনা (Adultery) বলা হয় সেখানে ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌন সম্পর্ককে যেনা বলেছে এবং কঠোর শাস্তির বিধানের কথা বলেছে। এরকম বিধান [illegible] পরও ইসলামকে ধর্ষণের প্রতিরোধে সহায়ক না বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়। ইসলামের সাক্ষী বিধান সম্পর্কে লেখকের বিভ্রান্তি রয়েছে। ইসলামের বিধান হলো যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা ধর্ষণ প্রমাণ হয় তবে তার উপর হদ্ (বা মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর হবে। কিন্তু যদি ধর্ষণের অভিযোগ ৩ জন বা ২ জন বা ১ জন বা কেবল আলামত দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার শাস্তি হবে তাজিরের আওতায়, যার পরিমাণ উপমহাদেশের একটি ইসলামী দেশে ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। তাজির বলা হয় ঐ সকল শাস্তিকে যা কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ করা হয়নি এবং যা একটি ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি তার আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকেন। তাজিরের বিধান রাসূল (সা.)-এর যুগ হতেই স্বীকৃত।

www.pathagar.com

[illegible] এ প্রকারই [illegible] একেবারে [illegible]। এ [illegible] অনেকের মতে [illegible]। (দেখুন ঃ [illegible] প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী [illegible] [illegible] আল্লামা জালালুদ্দীন আনসার, আল জানায়ী ফিল ইসলাম, আব্দুল [illegible] [illegible] ইসলামিক [illegible] কোর্স– ৩য় খণ্ড, আল্লামা জামাল [illegible])। ইমাম [illegible], [illegible] [illegible], ইবনে হাজাম ও অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠ আলেম এ মত পোষণ করতেন। [illegible] কুরআন ও সুন্নাহর এ বিষয়টি অকাট্যভাবে নির্ধারিত হয়নি, তাই আলেমদের এ [illegible] কারণ। সুতরাং অধ্যাপক সাহেব ইসলামী সাক্ষ্যের বিধান পুরোপুরি না [illegible] এ প্রসঙ্গে তার ভুল মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামী আইনে ধর্ষণের [illegible] নির্ভর নেই– এখানে তার উপর হদ অথবা [illegible] হবে, প্রমাণের [illegible] ভিত্তিতে। [illegible]

[illegible] করি, এ আলোচনার [illegible] একথা সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলাম [illegible] [illegible] চায় এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলামই [illegible] আদর্শ যাতে কোনো [illegible] অবৈধ যৌন সম্পর্ককে স্বীকার করে না, কোনো [illegible] থাকে না এবং [illegible] একটি নৈতিক সমাজ সৃষ্টি করতে চায়। [illegible] মুসলিম জাতির [illegible] [illegible] চর্চা ও [illegible] এবং আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে [illegible] [illegible] সমাজ গঠন করা। [illegible]

[illegible]

www.pathagar.com

শহরাঞ্চলের ছিন্নমূল দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হচ্ছে যারা গ্রামাঞ্চল থেকে শহর নগরে এসে পাড়ি জমিয়েছে। এসব মহিলারা অধিকাংশই বিবাহিতা কিন্তু স্বামীহারা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা। এদের প্রায় প্রত্যেকের সাথেই এক বা একাধিক শিশু সন্তানও দেখা যায়। এসকল শিশুর জীবিকা এই মহিলাদের উপরই নির্ভরশীল। এসব নারীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অবিবাহিতা যুবতী মেয়েও দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত এদের ভরণপোষণ করার মতো অভিভাবক না থাকায় জীবিকার অন্বেষণে এরা শহরে চলে এসেছে। শহরের এসব দুঃস্থ মহিলাদের অবস্থা গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের তুলনায় অধিক সংকটময়। শহরে এদের জন্য নিরাপদ তেমন কোনো আশ্রয় নেই। তদুপরি এদেরকে দুষ্ট লোকদের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। একইভাবে শহরের দুঃস্থ পুরুষদের এই বিপদ নেই যা শহরের দুঃস্থ নারীদেরকে মোকাবিলা করে চলতে হয়। সুতরাং শহর নগরের এসব দুঃস্থ নারীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অন্যান্য দুঃস্থ পুরুষ এবং নারীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে।

স্বাধীনতাপূর্বকালে অবস্থা এতটা মারাত্মক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ধ্বংসলীলা, স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের দুর্ভিক্ষ এই অবস্থাকে মারাত্মক রূপ দিয়েছে। এসময়ে শত শত পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় অবস্থায় গ্রাম থেকে শহরে চলে এসেছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এ সময়ে ঢাকা মহানগরীতেই এ ধরনের ছিন্নমূল মহিলার সংখ্যা ছিল তৎকালীন সময়ে ৫০ হাজারের উপরে। দেশের সবকটি শহর মিলিয়ে এদের সংখ্যা হয়তো এক লাখেরও বেশি হবে। এদের প্রায় প্রত্যেকের সাথেই আবার ২/৩টি করে শিশু সন্তানও রয়েছে। সুতরাং শিশু সন্তানসহ শহরাঞ্চলে ছিন্নমূল নারীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩ লাখ।

বয়সের দিক থেকে এসব ছিন্নমূল মহিলাদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ বছরের নারীর সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। এসব দুঃস্থ নারীদের অসহায় অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন শ্রেণীর অসৎ লোক এদের উপর নানা অত্যাচার চালাতে কুণ্ঠাবোধ করে না। দুঃস্থ নারীদের অনেক সময়েই এইসব দুষ্ট লোকের অসৎ ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সমাজ ক্রমেই নৈতিক দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ছে। বাড়ি ভাড়ার উচ্চমূল্যের কারণে সাথে শহরের এক বিপুলসংখ্যক স্বল্প বেতনভুক্ত চাকুরে ও শ্রমজীবীকে তাদের পরিবার পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন থেকে দিন যাপন করতে হয়। শহরের নানাবিধ অশ্লীল পত্র পত্রিকা ও নৈতিকতা বিবর্জিত সিনেমা এদের নৈতিক মানের অবনতি ঘটাচ্ছে ব্যাপকভাবে। তদুপরি হাতের কাছে এসব ভাসমান দুঃস্থ নারীর অবস্থান যৌন অপরাধকে মারাত্মকভাবে বর্ধিত করছে।

www.pathagar.com

মানবিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিক বিবেচনা করেই দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এইসব ভাগ্যাহত মহিলাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা এ বিষয়ে যে তৎপরতা দাবী করে সে তুলনায় আমাদের সরকার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা খুবই নগণ্য বলা যায়। এব্যাপারে সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটি ব্যাপক ভিত্তিক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা। অবশ্য এই মাস্টার প্ল্যানকে দুই অংশে ভাগ করে তার এক অংশে (১) দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্য অংশে (২) স্বল্পমেয়াদী বা আপাত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম আমাদেরকে সমস্যার মূল কারণ উদঘাটন করে তার সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে দুঃস্থ মহিলাদের দলে দলে শহরে চলে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নদীর ভাঙন। বাড়িঘর, জমিজমাসহ বিরাট বিরাট গ্রাম ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া বাংলাদেশে নিত্য বছরের ব্যাপার। এর ফলে এ দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। এর মধ্যে ২০/২৫ হাজার মানুষ আবার নতুন করে তাদের আশ্রয় ও জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা কিছুতেই করতে পারে না। ফলে এরাই জীবিকার অন্বেষণে নগরে চলে আসে। এদের মধ্যেই সেই সব দুঃস্থ মহিলা ও শিশু রয়েছে। নদীর ভাঙন পীড়িত এসব দুঃস্থ মানুষের শহরে আগমন বন্ধ করতে না পারলে দুঃস্থ মহিলাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না।

যাহোক এ সমস্যার সমাধান নিয়মিতভাবেই করা যেতে পারে- যেহেতু নদীভাঙন এলাকাসমূহ এবং ভাঙনের সময়কাল সবই আমাদের জানা আছে। এ উদ্দেশ্যে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ও ডেপুটি কমিশনারের পুনর্বাসন বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী পুনর্বাসন বিভাগ স্থাপন করা যেতে পারে। দেশের যে সকল এলাকায় সাধারণত নদীর ভাঙন হয়ে থাকে সেই সকল এলাকায় এর শাখা অফিস খুলে সহজেই পুনর্বাসন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে। মহকুমা আকারে নদী ভাঙন এলাকায় যথাসময়ে রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করে নতুন করে ভাঙনের কবলে নিপতিত লোকজনদেরকে এ ক্যাম্পে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবে। সেই সাথে অন্যান্য চর এলাকা বিশেষত নতুন করে জেগে ওঠা অঞ্চলে এমন উন্নয়ন সাধন করা উচিত যাতে ভাঙনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নিরাশ্রয় লোকদেরকে সেখানে পুনর্বাসিত করা যায়। এজন্য কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন যাতে এসব নতুন এলাকাসমূহে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়, কৃষি, ভূমিবন্টন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যথার্থভাবে পুনর্বাসন উপযোগী করা সম্ভব হয়।

বিশেষত দেশে ব্যাপকভাবে বা স্থানীয়ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সাথে সাথে এমন ব্যবস্থা নেয়া দরকার যাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুঃস্থ জনতা শহরে চলে যেতে বাধ্য না হয়। এজন্য

www.pathagar.com

[illegible] ব্যবস্থা অবশ্যই নেয়া উচিত। যে কোনো স্থানে দুর্ভিক্ষ [illegible] সাথে সাথে সেখানে গ্রামভিত্তিক লঙ্গরখানা খুলতে হবে। কেননা [illegible] পরিবর্তে ইউনিয়ন [illegible] পক্ষে প্রতিদিন খাবারের জন্য এত দূরে যাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। এজন্য [illegible] গ্রামে লঙ্গরখানা খুলে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে যথার্থভাবে [illegible] দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করা হলে নদীর ভাঙন এবং দুর্ভিক্ষ [illegible] শহরে লোক চলে আসার প্রবণতা বন্ধ হবে।

এরপর স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে যে সমস্ত [illegible] এসে ভাসমান অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হলো সেসব দুঃস্থ নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। উপরে প্রস্তাবিত পুনর্বাসন বিভাগের উপরই এ দায়িত্ব [illegible] হবে। বিভাগ প্রতিটি প্রধান শহরে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে শহরের [illegible] তাদের শিশু সন্তানদেরকে উক্ত ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করবে। অতঃপর [illegible] বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে মালিকের কাজে নিয়োগ [illegible] [illegible] হবে। বাকি মহিলাদেরকে তাদের নিজ নিজ গ্রাম বা ইউনিয়নে [illegible] কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করতে হবে। পূর্বে উল্লিখিত [illegible] [illegible] প্রতি বা ইউনিয়ন প্রতি এদের সংখ্যা হবে ৫ জন বা [illegible] প্রতি গ্রামে [illegible] জন দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন করা খুব কঠিন [illegible] সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে এদের কিছু সংখ্যককে [illegible] স্বজনের কাছে পুনর্বাসিত করা যেতে পারে। তবে অধিকাংশ দুঃস্থ নারীদের [illegible] পুনর্বাসন বিভাগকেই নিতে হবে। অবশ্য এ কাজে [illegible] [illegible], সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে [illegible] পুনর্বাসন বিভাগকে সহযোগিতা দিতে হবে।

যাই হোক, সরকারকে একাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। উন্নয়ন কাজের জন্য ৫ বছরে যেখানে ২৫ হাজার কোটি টাকা[1] ব্যয় করা হচ্ছে [illegible] এত বিরাট একটা মানবিক কারণে সামান্য ২/১ শত কোটি টাকা খরচ [illegible] উচিত।

১। বাজেট ১৯৭৬-৭৭ সালের কথা। এখন প্রতি বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে [illegible] টাকা ব্যয় করা হয়।

www.pathagar.com

মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আজকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরে কাবাডি, হকি, ব্যাডমিন্টন ও বাস্কেট বল খেলছে। বিদেশী কোচদের নিকট এ সব মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরেই ব্যাডমিন্টন ও বাস্কেট বল ট্রেনিং নিচ্ছে। তাদের ট্রেনিং ছেলেদের সঙ্গেই হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও পরিস্থিতি এরকম ছিল না। মেয়েদের ট্রেনিং আলাদাই হতো। বয়স্কা [illegible] সেলোয়ার কামিজ পরেই খেলতো। কিন্তু আজকাল হাফপ্যান্ট পরে খেলার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগেই এর [illegible] পর্যালোচনা করা দরকার এবং জাতি ও সরকার এ ব্যাপারে সঠিক পথ অনুসরণ করবে [illegible]।

[illegible] আমাদের ঐতিহ্যের আলোকে বিচার করতে হবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, [illegible] শরীরের সুস্থতা ও নির্মল আনন্দের প্রয়োজন মহিলাদের [illegible] কাজেই তাদের জন্যও খেলাধুলার যথাযোগ্য ও পর্যাপ্ত সুযোগ [illegible] হবে। এ ব্যাপারে নারীদের অবহেলা করা কোনো রকমই ন্যায়সঙ্গত হবে না। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলামী ঐতিহ্য আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। কাজেই মহিলাদের খেলাধুলার পুরো ব্যবস্থা আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষার আলোকেই করতে হবে।

[illegible] পুরুষ ও নারীদের অবাধ ও অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কাজেই মহিলাদের ক্রীড়া ব্যবস্থা আমাদেরকে আলাদাই করতে হবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের খেলাধুলা ও খেলার প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা আলাদা করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অনেক স্কুল কলেজেই আলাদা মাঠ রয়েছে। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন শহরে যে সব ষ্টেডিয়াম রয়েছে মহিলাদের খেলাধুলার জন্য এসব ষ্টেডিয়ামও ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন পুরুষ দর্শকদের প্রবেশাধিকার দেয়া যাবে না। এভাবে একই ষ্টেডিয়াম দ্বারাই আমরা আলাদাভাবে পুরুষ ও মহিলাদের খেলাধুলার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবো। তেমনিভাবে পুরুষ ও মহিলাদের জাতীয় ক্রীড়া অলিম্পিকও আলাদা অনুষ্ঠান করা আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। বর্তমানেও পুরুষ ও মহিলারা প্রতিটি আইটেম দৌড়, লাফ, সাঁতার ইত্যাদি আলাদা করে প্রতিযোগিতা করে থাকে। কাজেই পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে মহিলাদের জাতীয় অলিম্পিক করা পুরোপুরি ন্যায়সংগত হবে। আলাদা করে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হলে অধিক সংখ্যায় মহিলা দর্শক এসব অলিম্পিক দেখতে উৎসাহিত হবে।

মহিলাদের ক্রীড়ার পোশাক কোনো মতেই পুরুষদের মতো হতে পারে না। এ কথা একেবারে স্পষ্ট যে আল্লাহতায়ালাই মেয়েদের শালীন পোশাকের উপর পুরুষদের পোশাক অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেখানে কুরআন মহিলাদের বাইরে যাওয়ার

www.pathagar.com

সবার চাদর ব্যবহার করতে বলেছে, সেখানে আমরা কি করে [illegible] সামনে মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানকে বৈধ মনে করতে পারি? [illegible] মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেলোয়ার, ফুলপ্যান্ট বা এ ধরনের পুরো [illegible] পোশাকেই হতে হবে। [illegible] ব্যবহার করতে বাধ্য করা কোনোক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হবে না।

ক্রীড়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শরীর ও মনের বিকাশ, পদক পাওয়া বা বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাওয়া নয়। কয়েকটি পদকের জন্য আগ্রহের দেয়া [illegible] কেমন করে ঠিক হতে পারে? পূর্ণদৈর্ঘ্য পোশাক পরে নারীরা যে সব খেলাধুলা [illegible] পারে কেবল তাই করা ঠিক হবে। সত্যিই যদি পূর্ণদৈর্ঘ্য পোশাকে কোনো কোনো ক্রীড়ার অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে সে সব ক্রীড়া আয়োজন পরিত্যাগ করতে হবে। সরকার, মহিলা নেতৃবৃন্দ ও সাধারণভাবে সব নারীরই বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত এবং মহিলাদের ক্রীড়ায় সঠিক নীতি অবলম্বন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

এসব অশালীন খেলা চলতে থাকলে তা বয়কট করা প্রয়োজন। মেয়েরা, [illegible] কর্তৃপক্ষ এসমস্ত অশালীন খেলা বয়কট করতে পারেন। অভিভাবকগণ [illegible] অশালীন খেলায় যোগদান করা থেকে তাদের মেয়েদেরকে বুঝিয়ে বিরত রাখতে পারেন। এ বিষয়ে আলেমগণ ও চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সভায় আলোচনা করে জনমত গঠন করতে পারেন।

(লেখাটি ১৯৭৮ সালের পরিস্থিতিতে লেখা হয়েছিল)

www.pathagar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible] অধিকার ... ব্যবস্থাপনায় চাকরি করা এবং নারীদের নির্ধারিত পোশাক [illegible] নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর [illegible] জায়েজ কিনা? এ প্রশ্নের [illegible] যে জবাব দেয়া হয়েছে তার মূল অংশ নিম্নরূপ [illegible] পুরুষের সাথে মিলেমিশে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা [illegible] কাজকর্ম নারীদের জন্য হারাম" (সাপ্তাহিক সোনার বাংলা : ২০ এপ্রিল, ১৯৯৫ সংখ্যা)।

এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে উপরের সাধারণ বক্তব্য রাখায় এ কথাও ওঠে যে আমাদের দেশে বর্তমানে বিরাজিত মিশ্র পরিবেশে কাজ করা কি পুরুষের জন্যও হারাম? এর উত্তর দেয়া হয়নি। যেসব নারী বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে পুরুষ নারীর মিশ্র পরিবেশে কাজ করেছে তাদের ব্যাপারে কি বিধান তাও এতে বলা হয়নি। এর ফলে নানা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে।

আমাদের দেশে যেসব নারী বিভিন্ন অফিস আদালতে, মাঠে ঘাটে কাজ করছে তাদের অধিকাংশ বাধ্য হয়েই এ পরিবেশে কাজ করছে এ কথা সবারই জানা। অফিস আদালত কেন, লক্ষ লক্ষ নারী রুজি-রোজগারের অভাবে রাস্তাঘাটে ইট ভাঙছে, রাস্তার মাটি কাটছে। এসব নারীরা চাইলেই আলাদা কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাবে না। সরকার বা অন্য কেউ তা দিয়ে দেবে না। আমাদের দেশে ব্যাপক বেকারত্বের জন্য পছন্দমতো চাকরি বাছাইয়ের প্রশ্নই ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে যারা কুরআনের বিধান মতো চাদর পরে (সূরা আহ্‌যাব, ৫৯ আয়াত) কোনো বৈধ পেশায় কাজ করবে তা নাযায়েজ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রুজি-রোজগার করার অধিকার নারী পুরুষের সমান (সূরা নিসা, ৩২ আয়াত; হাম্মুদাহ্ আবদুল আতি, ইসলাম ইন ফোকাস)। অবশ্য কোনো দেশের ইসলামী সরকার যদি আলাদা কাজের ব্যবস্থা করে দেয় সে কথা ভিন্ন।

এখানে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে যে বিষয়টি নবী (সা.) সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে ভিন্ন পুরুষ ও নারীর নিভৃত সাক্ষাৎ (খালওয়া) (বুখারী, মুসলিম, আহমদ)। এ নিভৃত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকে প্রয়োজনে অথবা বাধ্যগত অবস্থায় নারী পুরুষের একত্রে কাজ করা নাযায়েজ নয়, অবশ্য তাকে চাদর দিয়ে বুক ও মাথা ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে (সূরা আহ্‌যাব ৫৯ আয়াত, ফাতহী ওসমান : মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ইস্যুজ এন্ড চ্যালেঞ্জেস, পৃ: ৪৪ ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ন কালিফোর্নিয়া প্রকাশিত)।

এখানে একথাও উল্লেখ করা যায় যে, ইসলাম নারী পুরুষের কোনো অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতার বিধান দেয়নি। ইসলাম নারীদের মসজিদে, ঈদে, জুমার নামায পড়ার এব

www.pathagar.com

[illegible] করার যেভাবে সুযোগ দিয়েছে এতেই তার প্রমাণ রয়েছে। ইসলামের [illegible] যুগে মহিলারা যেভাবে ক্ষেত-খামারে স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে তাও কোনো [illegible] বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করে না। ইসলাম [illegible] বিচ্ছিন্নতার বিধান দিয়েছে। অর্থাৎ যা প্রয়োজন নয় এমন ধরনের মেলামেশা ইসলাম অনুমোদন করে না।

একত্রে কাজ করায় নজর সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু ইসলাম [illegible] কাজকর্ম করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় নজরকে নিষেধ করেনি। ইসলাম যা নিষেধ [illegible] তা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় লালসার নজর (হিদায়া, নজর অধ্যায়; ইউসুফ আল কারদাভী, ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান, পৃ: ২৩৯)।

সর্বশেষে বলা যায় যে, কোনোকিছুকে হারাম বলার পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন :

"যে জিনিসটার হারাম হওয়ার কথা নিশ্চিত অকাট্যভাবে জানা গেছে কেবলমাত্র [illegible] জিনিসটা ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কালের মনীষীগণ কখনও [illegible] [illegible] বলতেন না" (ঐ: ইউসুফ আল কারদাভী)।

www.pathagar.com

সামাজিক কুসংস্কার ও নারী

আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলো ধারণা বা প্রবণতা চালু আছে যা কোনোভাবেই যুক্তির সাথে এবং বর্তমান যুগের প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়– যাকে কুসংস্কারও বলা যায়। এটা শুধু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই নয়, শহরের নারী পুরুষের মধ্যেও দেখা যায়। এখন এই কুসংস্কার বা কুধারণাকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? আমরা সে সব বিষয়কে বলতে পারি যা ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের মধ্যে চলে আসছে, যা যুক্তিভিত্তিক নয়। বলা যায়, এটা এক প্রকার অজ্ঞতানির্ভর বিশ্বাস।

বাংলাদেশে এই কুসংস্কার ব্যাপক। আমরা আমাদের সমাজে এর ব্যাপক প্রভাবও লক্ষ্য করি। আমাদের মাঝে নানা ধরনের কুসংস্কার রয়েছে যেগুলোকে আমরা কখনো বুঝে শুনে আবার কখনো না বুঝেই করে থাকি। এসবের মধ্যে রয়েছে নারীকে দুর্বল ও অনুপযুক্ত ভাবা, তার শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা, কন্যা সন্তানের জন্য ব্যয়কে অপচয় মনে করা। পুত্রকে অধিক গুরুত্ব দেয়া। এ সকল ধারণাই অবৈজ্ঞানিক এবং ইসলাম বিরোধী। নারীকে কোনো অংশে আল্লাহপাক অনুপযুক্ত করেননি। বিজ্ঞানও তা বলে না। তবে নারী পুরুষের দায়িত্বের কিছু কিছু পার্থক্যের জন্য আল্লাহতায়ালা তাদের শারীরিক গঠনে পার্থক্য করেছেন। কিন্তু নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ আল্লাহর উত্তম (excellent) সৃষ্টি (সূরা ত্বীন)।

কন্যা সন্তান আল্লাহর দেয়া একই রকম নিয়ামত। তার মর্যাদাও এক (দ্রষ্টব্য : ইসলামে কন্যা সন্তানের অধিকার : উজ্জীবক বার্তা, কন্যা শিশু দিবস সংখ্যা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৯)।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব না বোঝা আমাদের সমাজে এই কুসংস্কার, কুধারণার শুধুমাত্র একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করলে ভুলই হবে– এটা একটা সমস্যাও। আমাদের সমাজে নারীর এক বিরাট অংশ অশিক্ষিত। গ্রামীণ সমাজে এটা আরো ভয়ানক। সেখানে শিক্ষার হার যথেষ্ট কম।

আবার বর্তমান সমাজে নারীর সামাজিক ভূমিকা কম থাকার ফলে সমাজে কিছু অসঙ্গতি দেখা দেয়। নারীর ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা হয়। নারীকে কেউ কেউ অবহেলার পাত্র হিসেবে অজুহাত দেখিয়ে ফায়দাও হাসিল করে থাকে। নারীকে ঘরবন্দী করে রাখার চেষ্টা করা হয়। অথচ নারীর শালীনভাবে সবখানে যাওয়ার এবং সবকিছু করার অধিকার ইসলামে রয়েছে।

এখন যদি আমরা এর ফলাফল বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে দেখবো– এর ফলাফল কোনোভাবেই ভালো হচ্ছে না। আগেও কখনো ভালো ছিল না। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে এটা কখনোই ভালো হয়নি। এমনকি এটা কারোর জন্যেও ভালো নয়। নারী শিক্ষার অভাবে তাদের ব্যাপারে আমাদের সমাজে এখনো অনেক ভুল বোঝাবুঝি

www.pathagar.com

রয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা নানা ধরনের সামাজিক ভূমিকা [illegible] করতে পারছে না। তারা নানা প্রতিবন্ধকতায় নিজেদের যোগ্যতাকে বিকাশের [illegible] থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই সব অজ্ঞতা, কুসংস্কার কিংবা কুধারণার প্রভাব সমাজে পড়ে। [illegible] সামাজিকভাবে বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। সমাজে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। [illegible] উন্নয়নে নারীরা যে ধরনের ভূমিকা রাখতে পারতো এই ধারণাগত [illegible] [illegible] একটা অংশ সে ভূমিকা রাখতে পারছে না।

এখন আমরা যদি এইসব [illegible] সমাধান খুঁজতে চাই তাহলে এর উৎসগুলো [illegible] খুঁজে বের করতে হবে। এর জন্য আমাদেরকে অনেক পথ অতিক্রম করতে [illegible] সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি নজর দিতে হবে তা হলো শিক্ষা। [illegible] সমস্যার সমাধান দিতে। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা হতে হবে মানবিক, [illegible] আধুনিক। আমরা এখানে আধুনিক শিক্ষা বলতে সেটাই ধরছি যার সাথে নৈতিকতার [illegible] [illegible] পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় থাকবে। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক (Authentic) জ্ঞান দিতে হবে। এই শিক্ষায় মধ্যে থাকতে হবে নবী রাসূলের [illegible] তারা কিভাবে তাদের জীবনকে পরিচালিত করেছিলেন তা আমাদের জন্যেও [illegible] হিসেবে নিতে হবে। ধর্মের নামে যে কুসংস্কার চলছে তার থেকে মুক্তির উপায় ইসলামের সত্যিকার জ্ঞান দেয়া।

আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলামের সঙ্গে সংঘাত করে আমরা কোনো [illegible] করতে পারবো না। আমাদের দেশের মেজরিটি মুসলিম বলে [illegible] প্রকৃতপক্ষেই, কেউ অন্ধ অনুকরণে হোক কিংবা শত্রুতামূলকই হোক [illegible] বিরোধিতা [illegible] উসকে দেয়— তাদের জানা উচিত ইসলাম [illegible] [illegible]। [illegible] ইসলাম অন্ধ অনুসরণে [illegible] একথা আমাদের দেশের এনজিওগুলোকে মনে রাখতে হবে। তাদের [illegible] প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিতে হবে। তারা গ্রামীণ কাঠামোকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে [illegible] করতে পারে।

www.pathagar.com

নারী পুরুষের করমর্দন

মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন আচার আচরণ প্রভৃতিকে মার্জিত রূপ দেয়ার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানই ইসলাম নামে পরিচিত। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘোষণা "সর্বোত্তম আচার আচরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্যেই আমাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।" সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের সাথে ওঠা বসা চালচলনের যেসব রীতি গ্রহণযোগ্য এবং কল্যাণকর তা তাই নবী রাসূলগণ বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) শিখিয়েছেন।

পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের একটা অন্যতম মাধ্যম করমর্দন। এটা আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হিসেবেই এখন বিবেচিত। সামাজিক আচার আচরণের এই বিশেষ দিকটিও আল্লাহর রাসূলের শিক্ষার গণ্ডি বহির্ভূত নয়। এ সম্পর্কে যেমন আল্লাহর রাসূলের নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে তেমনি রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বাস্তব দৃষ্টান্ত।

পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম এই হাত মেলানোটা নিছক আধুনিক রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা মাত্রই নয় বরং এটা অকৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত সমাজ থেকেই এর প্রচলন। এমনকি এই হাত মেলানোর মুহূর্তে আমাদের রাসূল একটি বিশেষ দোয়াও শিখিয়েছেন, "ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম" অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকেও ক্ষমা করুন।"

তবে এক্ষেত্রে পুরুষ পুরুষদের সাথে এবং নারী নারীদের সাথে হাত মেলাবে এটাই ইসলামী রুচি ও সভ্যতার দাবী। এর বিপরীতে পুরুষ নারীর সাথে বা নারী পুরুষের সাথে হাত মেলানোর কোনো অবকাশই ইসলামে নেই।

আমাদের নেতা ও একমাত্র আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ সম্পর্কে কি বাস্তব আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন তা গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর হাতে হাত রেখে তৎকালীন মুসলমানরা বায়আত গ্রহণ করতেন। বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল করীম (সা.) এর যুগে নারীদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে ভিন্নতর ছিল। বায়আত গ্রহণকারী পুরুষ ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর হাতে হাত দিয়ে ওয়াদা করত। কিন্তু নারীদের কাছ থেকে বায়আত নেয়ার সময় তিনি কখনই কোনো নারীর হাতে হাত রাখেন নাই। হযরত আয়েশা (র.) বলেন, খোদার শপথ বায়আত নেয়ার সময় রাসূল (সা.) কখনও কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করেননি। তিনি নারীদের কাছ থেকে বায়আত নেয়ার সময় শুধু মুখে বলতেন যে, "আমি তোমার নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করলাম"। (বোখারী ও ইবনে জরীর)।

www.pathagar.com

উমাইয়া বিনতে রুকাইয়া বর্ণনা করেছেন, "আমি ও কয়েক জন মহিলা বায়আত হওয়ার জন্য নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি কুরআনের একটি আয়াত অনুযায়ী আমাদের নিকট থেকে বায়আত নিলেন। এ সময় আমরা যখন বললাম, "আমরা ন্যায়সঙ্গত কাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করব না।" তখন তিনি বললেন, "যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ও সাধ্যে কুলাবে তা করবে।" আমরা বললাম, "আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) আমাদের জন্যে স্বয়ং আমাদের চেয়েও অধিক দয়ালু।" পরে আমরা নিবেদন করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাত এগিয়ে দিন আমরা আপনার হাতে বায়আত করব।" তিনি বললেন, স্ত্রীলোকদের সাথে করমর্দন করি না। আমি তোমাদের কাছ থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করব। অতঃপর তিনি প্রতিশ্রুতি নিলেন। অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "রাসূলে করীম (সা.) আমাদের মধ্যে কোনো নারীর সাথেও করমর্দন করেন নাই।" (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মাজাহ, ইবনে জরীর, মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি ও নাসায়ী)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ইসলামের এ শিক্ষার বিপরীত আচরণ অনেক স্থানে করা হচ্ছে। আমাদের সবারই এ আচরণ অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা রাসূল (সা.) যা করেননি তা আমাদের করা কখনো সঙ্গত হতে পারে না।

www.pathagar.com

নারী পুরুষের পারস্পরিক অধিকারের আলোচনা

ইসলামের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার জন্য যে সব শক্তিকে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হতে পারে তার মধ্যে নারী সমাজ একটি। কেননা এ ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে রয়েছে যে ইসলামে নারীদের যথাযোগ্য অধিকার দেয়া হয়নি এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। অথচ কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ ও সুষম উপলব্ধি মোতাবেক এ কথা সত্য নয়।

শিক্ষিত নারীদের ইসলামের দিকে টানতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামের পূর্ণজ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। নারী পুরুষের কিছু কিছু পার্থক্যকে বড় করে না দেখিয়ে প্রথমত: তাদের মিলগুলি দেখাতে হবে। যেমন পুরুষ ও নারীর আমল (নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত) এর মূল্য ও সওয়াব সমান (সুরা আহ্যাব-৩৫, আল ইমরান-১৯৫)। তাদের খাবার, বাসস্থান, চিকিৎসা, বস্ত্র ও শিক্ষার অধিকার সমান। তাদের সম্মানও সমান (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১৩)। নবী (সা.) বলেছেন সকল মানুষ চিরুনীর দাঁতের মতো সমান। এ সমতা সম্মানের। মূল মানবতার।

তারপর যে সব বিষয়ে আল্লাহপাক নারীদেরকে বেশি সুবিধা বা অধিকার দিয়েছেন তার আলোচনা করা যায়। যেমন আল্লাহ্ নারীকে সাধারণভাবে সৌন্দর্য বেশি দিয়েছেন। তেমনিভাবে ভরণপোষণ, মোহরানা কেবল নারীর প্রাপ্য। নামাজ, রোজা, হজ্বেও নারীর কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আছে। এরপর পুরুষদের যে সব বিষয়ে কিছু বেশি অধিকার বা সুবিধা আল্লাহপাক সামগ্রিক বিবেচনায় দিয়েছেন (যেমন পরিবারের কর্তৃত্ব, সম্পত্তির অধিকার) তার আলোচনা যুক্তিসহ প্রয়োজনে করা যায়। তা হলে নারীরা ইসলামের সামগ্রিক পলিসি ও যুক্তি বেশি অনুধাবন করতে পারবে এবং ইসলামের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারবে।

www.pathagar.com

শিশু গ্রহণ আইন

আমাদের দেশে যাদের সন্তান নাই তারা সাধারণত পালনের জন্য অন্যের সন্তান গ্রহণ করে থাকেন। পথে পাওয়া শিশু সরকারী প্রতিষ্ঠানে স্থান দেয়ার পর তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এসব শিশুর অনেকেই পিতৃমাতৃ পরিচয়বিহীন হয়ে থাকে। কেননা, ১/২ দিনের শিশুকেও অনেক সময় রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে যে রাস্তা থেকে কেউ না কেউ তাদের তুলে নিয়ে পালাবে। সরকারী এতিমখানায় এতিমদেরও পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে।

২. পাশ্চাত্যে এসব শিশুকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয়া হয়। ঐ সব দেশে এ জন্য আইন রয়েছে। বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালে আন্তঃদেশ দত্তক আইন করা হয়েছিল। সেই আইনের আওতায় বাংলাদেশের শিশুদের বিদেশীদের নিকট দত্তক দেয়া হতো। কিন্তু বিদেশে এসব শিশুদের অবৈধ ব্যবহারের কিছু ঘটনা ঘটার ফলে এই আইন বাতিল করা হয়।

বাতিল করার অন্য একটি কারণ ছিল– মুসলিম শিশুদের খৃস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। এটা ছিল বাস্তব পরিস্থিতি। কেননা, দত্তক গ্রহণকারীরা ছিল সাধারণত আমেরিকা ও ইউরোপের খৃস্টান।

৩. ইসলাম সব শিশুকে ভালোবাসার নজরে দেখে। ইসলাম পথে পাওয়া বাচ্চার (ফিকাহর পরিভাষায় যাদেরকে লাকিত বলে) অধিকারও রক্ষা করে। এসব অসহায় বাচ্চাকে পথ থেকে তুলে নেয়া ওয়াজিব। মুসলিম দেশে এসব শিশু পাওয়া গেলে তাদেরকে মুসলিম গণ্য করতে হবে (হিদায়া, লাকিত অধ্যায়)।

ইসলাম কোনো অভাবী পিতামাতার সন্তান বা অন্য অসহায় শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকে খুবই ভালো কাজ মনে করে। তাদেরকে সন্তানের মতোই পালন করা কর্তব্য। তবে এসব শিশু তাদের আসল পিতার নামেই পরিচিত হবে। যদি পিতার নাম জানা না থাকে, তবুও তাদের সে শিশু পালকের বংশের শিশু এ মিথ্যা পরিচয় ইসলাম জায়েজ মনে করে না। এরকম করা হলে ইসলামের উত্তরাধিকার ও বৈবাহিক আইনে জটিলতা ও পরিবর্তন সূচিত হয়। যার উত্তরাধিকার নাই তাকে উত্তরাধিকার দেয়ার অর্থ অন্যের উত্তরাধিকারে হস্তক্ষেপ করা।

তেমনিভাবে যার সঙ্গে বিবাহ বৈধ (যেমন পালকের কন্যা) তার সঙ্গে বিবাহ অবৈধ মনে করাও ইসলামী শরীয়ত বিরোধী মত এতে কোনো সন্দেহ নাই।

৪. কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইসলাম পালিতদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের বিরোধী নয় বরং সমর্থক। কেননা এসব শিশুদের অধিকার রক্ষা করাও

www.pathagar.com

ইনসাফের দাবি। এ রকম আইন না করা হলে শিশুরা অসহায় হয়ে থাকবে। তাই এসব শিশুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় আইন করা দরকার যাতে ব্যবস্থা থাকতে পারে যে পালক পালিত শিশুর পূর্ণ ভরণপোষণের জন্য দায়ী থাকবে এবং কোনো অবস্থাতেই ওই শিশুকে মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন করা যাবে না। তেমনিভাবে পালক পালিতের পক্ষে সম্পত্তির অনধিক ১/৩ অংশ উইল (অসীয়ত) করবে এ বিধানও থাকতে পারে।

সরকারকেও এ ধরনের শিশুর স্বার্থ দেখার ক্ষমতা আইনে দেয়া যেতে পারে। এ বিধানও এ আইনের রাখা যেতে পারে যে পালক যদি অভাবগ্রস্ত বা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার ভরণপোষণ করা সক্ষম ও বয়স্ক পালিত ব্যক্তির দায়িত্ব হবে। এ আইনের নামকরণ করা যায় "বাংলাদেশ শিশু গ্রহণ ও প্রতিপালন আইন।"

(দৈনিক ইনকিলাব : ০৬.০২.১৯৯৮)

www.pathagar.com

নারীর প্রধানমন্ত্রীত্ব

পাকিস্তানে বেনজীর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে মহিলাদের প্রধানমন্ত্রীত্ব শরীয়ত সম্মত হওয়া নিয়ে কিছু লোক প্রশ্ন তুলেছেন। যেহেতু বিষয়টি কেবল পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এ জন্য এ সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদন করছি। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমদের "ইসলামী শাসনতন্ত্র" সম্পর্কিত কনভেনশনে যে ২২টি মূলনীতি ঠিক করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিল যে কেবল রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ ও মুসলিম হবেন। তা করা হলে ইমামকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যে পুরুষ ও মুসলিম হতে হয় সে শর্ত পূরণ হয় বলে তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। সে ভিত্তিতেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল, কেননা রাষ্ট্রপ্রধানই দেশের সর্বোচ্চ পদ এবং তার নামেই প্রশাসনিক কাজকর্ম করা হয়– প্রধানমন্ত্রীর নামে নয়।

এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে নতুন করে বিতর্কমূলক করা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হবে না। তদুপরি যদি কোনো মুসলিম দেশে এমন পার্টি ক্ষমতায় থাকে যারা ইসলামী আদর্শ কায়েমের দাবিদার নন তা হলে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী পুরুষ হলেন বা নারী হলেন তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা তারা ইসলাম নয় তাদের নীতিই কায়েম করবেন। অবশ্য ইসলামী দল ক্ষমতায় গেলে তারা সর্বক্ষেত্রে ইসলাম থাকে উত্তম মনে করে সেই মোতাবেক নেতা নির্বাচন ও পলিসি নির্ধারণ করবেন।

(দৈনিক সংগ্রাম : ১৩.০৩.১৯৮৯)

www.pathagar.com

ভারতে পাচারকৃত দশ মেয়ের প্রত্যাবর্তন

একটি প্রধান দৈনিকের ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, ভারতে পাচারকৃত ১০টি মেয়ে দেশে ফিরেছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে এরা ভারতে পাচার হয়েছিল। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি বেনাপোল সীমান্তে এসব মেয়েদের ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে গ্রহণ করে। এরা ভারতে জুভেনাইল বোর্ডের ভিকটিম হিসেবে আটক ছিল। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

এসব মেয়ের বর্ণিত বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, তাদের কেউ কেউ প্রেমিক দ্বারা প্রতারিত হয়ে ভারতে পাচার হয়ে যায়। কেউ কেউ বিবাহের প্রলোভনে পড়ে পাচার হয়ে যায়। কাউকে কাউকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হয়।

অন্য একটি জাতীয় দৈনিকের ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের ১০ হাজার নারী ও শিশু প্রতিবছর ভারতে পাচার হচ্ছে। অধিকাংশ নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের জেলা যশোর ও সাতক্ষীরা দিয়ে। তবে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এসব পাচার ঘটে অনেক ক্ষেত্রেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। নারী পাচারকারী চক্রের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক আছে বলে প্রতিবেদনে দেখা যায়।

নারী ও শিশু পাচার ব্যাপক হয়ে যাওয়া একটি মানবিক সমস্যা। এ সমস্যা ১৫ বছর পূর্বেও ব্যাপক ছিল না। বিগত ১৫-২০ বছরে এ সমস্যাটি এত বড় হতে পেরেছে। নারী ও শিশু পাচার সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহের জন্য কত মারাত্মক তা আমরা সবাই জানি।

এটা অত্যন্ত বেদনার কথা যে নারী পাচার কেবল বাংলাদেশের নয় সারাবিশ্বে এটি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। নেপাল, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, রাশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও প্রতি বছর অসংখ্য নারী পাচার হচ্ছে। আধুনিক বিশ্ব এবং আধুনিক আইন তা রোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি এমন এক সমস্যা যার উপর জাতিসংঘের গভীর নজর দেয়া উচিত। জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক প্রটোকল বা চুক্তি হওয়া উচিত। যার আওতায় প্রত্যেক দেশ নারী পাচার রোধ করতে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে এবং পতিতালয় বন্ধ করতে (অন্তত পতিতালয় থেকে সকল অপহৃত মেয়ে উদ্ধার করতে) বাধ্য থাকবে।

আমাদের সরকার এ সমস্যার জন্য চিন্তিত; কিন্তু কেন জানি এ ব্যাপারে যতটুকু কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ছিল তা নেয়া হচ্ছে না। ভারতের সাথে এ ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট চুক্তি হওয়া উচিত। বাংলাদেশ রাইফেলসকেও এ ব্যাপারে আরো তৎপর হওয়া উচিত। সীমান্তের জনমতকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সকল সামাজিক সংস্থাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, এ সমস্যা সমাধানে সরকার আরো তৎপর হবেন। সুশীল সমাজের প্রত্যেকটি অংশকে এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে।

(সম্পাদকীয় : ২৬.১২.১৯৯৯)

www.pathagar.com

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

বিগত ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বেগম রোকেয়া পদক-৯৯' বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি সরকারের নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ১৪০০০ মহিলাকে স্থানীয় সরকার সংস্থায় নির্বাচন করা হয়েছে। শিগগিরই একজন মহিলাকে বিচারক হিসেবে সুপ্রিমকোর্টে নিয়োগ করা হবে।

তিনি বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, তিনি কুসংস্কার ও সামাজিক অন্যায় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাধারণভাবে সকল নারী এবং বিশেষভাবে মুসলিম নারীকে শিক্ষিত ও মুক্ত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন।

সরকার বেগম রোকেয়ার অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রোকেয়া পদক চালু করে একটি মহৎ কাজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষেই বেগম রোকেয়া এ উপমহাদেশের এক অনন্য সাধারণ মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ। তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর অবদান অত্যন্ত বেশি। তিনি মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি তালাকের অপব্যবহার, অশিক্ষা, পর্দার নামে অবরোধ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমাজকে অনেকটুকু এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি শালীনতা ও পর্দার বিরোধী ছিলেন না। তিনি নিজেও শালীনতার সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদও ছিলেন। তিনি পর্দা, বিবাহ, তালাক, যৌতুক, নারীর অধিকার এসব ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নারী নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগের কথা বলেছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বাংলাদেশে পরপর দু'জন নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষণ, খুন ও নির্যাতন কমেনি। সমগ্র বিষয়টির একটি মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এ রকম কেন হচ্ছে? আমাদের পদক্ষেপগুলো কেন কার্যকর হচ্ছে না? কোথায় গলদ? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে কারিকুলামে পরিবর্তন দরকার যাতে জাতি নারীকে সত্যিকার অর্থে সম্মান করতে শেখে। পুলিশ বাহিনীর সংস্কার দরকার যাতে নারী নির্যাতনের সমস্যাগুলো আরো ভালো করে তারা বিহিত করতে পারে। মনিটরিং-এর সমস্যা, এ বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর এ বিষয়টি নিয়মিত ভিত্তিতে মনিটরিং করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, এই প্রস্তাবসমূহ সরকার বিবেচনা করে দেখবে।

(সম্পাদকীয় : ২৮.১২.১৯৯৯)

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীরনগর পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনে করণীয়

কিছুদিন থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ঘটছে তা জাতি অবহিত আছে। একটি ছাত্র সংগঠনের দু'টি গ্রুপের একটি গ্রুপ (যেটি ধর্ষক গ্রুপ নামে পরিচিত হয়েছে) কয়েকটি হল অস্ত্রের বলে দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ওই সংগঠনের অন্য গ্রুপটি (যা হত্যাকারী গ্রুপ নামে পরিচিত হয়েছে) হলগুলো পুনর্দখল করে। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ ধর্ষক গ্রুপের বিতাড়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো পত্রিকা এটিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভ্যুত্থান বলেও উল্লেখ করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অপরাধীদের দণ্ডবিধির আওতায় বিচার ও শাস্তি দাবি করেছে এবং ঢাকা-আরিচা সড়ক তারা অবরোধও করেছে।

এর পূর্বের ঘটনাও আমরা জানি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা বিরাজ করছিল। বেশ কিছু ছাত্রী ধর্ষিত হয়েছিল। সে পরিস্থিতিতে তদন্তের পর তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাত্র একজন ছাত্রকে চিরতরে বহিষ্কার করা হয়, অন্য কয়েকজনকে কয়েক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ বা ধর্ষণে সহযোগিতা প্রমাণিত তাদের মাত্র কিছু সময়ের জন্য বহিষ্কার সবাইকে বিস্মিত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও কেন তখনই করা হলো না তাও সবাইকে অবাক করেছে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত অবস্থা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি থেকে আঁচ করা যায়। এটি কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নয়। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমবেশি একই অবস্থা বিরাজ করছে। অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। তারা চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক মারামারি ও খুনাখুনি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। শিক্ষকদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, তারাও বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী গ্রুপে বিভক্ত। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের অভিযোগ অনেক।

এ পরিস্থিতিতে জাতিকে বিশেষ করে সরকার, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে শিক্ষাঙ্গনকে সকল অনিয়ম থেকে উদ্ধার করে শিক্ষাকে পুনর্বহাল করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকরা রাজনীতি করুন এটা তাদের অধিকার; কিন্তু তারা কি কয়েকটি দফা, যা তাদের রাজনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, এর ওপর একমত হতে পারেন না? তারা কি একমত হতে পারেন না যে, ছাত্রদের শৃঙ্খলা (discipline)-এর প্রশ্নে আমরা কোনো আপস করবো না? তারা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যে, শিক্ষার মানকে তারা বহাল রাখবেন? শিক্ষক নিয়োগে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না এবং দলীয় প্রভাব থেকে

www.pathagar.com

মুক্ত হবে ? তারা অবশ্যই তা পারেন। এ জন্য আমরা সকল কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে আবেদন করবো, তারা যেন আমাদের কথাগুলো ভেবে দেখেন।

দেখা যায়, ছাত্রদের মধ্য থেকে যারা খুনি, এমনকি ভাড়াটে খুনি তৈরি হচ্ছে, তাদের অনেকেই মাদকাসক্ত। কিভাবে তাদের মধ্যে নৈতিকতা ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়টি সকল শিক্ষককে ভাবতে হবে। সরকারকেও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছাত্রদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের কোনোভাবেই ক্ষমা করা উচিত নয়। সরকার ও বিরোধী দল সবাইকে আমরা এ বিষয়ে একত্রে বসতে বলি এবং সকল ছাত্র সংগঠন থেকে অপরাধীদের বের করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাই। সরকারী দলকেই এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

(সম্পাদকীয় : ১৪.০৮.১৯৯৯)

www.pathagar.com

গ্রাম্য বিচারের নামে নির্যাতন

সিলেটের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বালাগঞ্জ থানার দেওয়ানবাজার ইউনিয়নের নিজগহরপুর গ্রামের সেলিনা ও তার মাকে গ্রামের সমাজপতিরা লাঠিপেটা ও ছুরিকাঘাতের পর জুতার মালা পরিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়েছে। এখন তারা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করছে এবং অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। খবরে আরো জানা যায় যে, ওই গ্রামের ওইসব সমাজপতি বিচারের নামে এসব জুলুমনির্যাতন বহুদিন থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গ্রাম্য বিচারের নামে এসব অত্যাচার হরহামেশা হচ্ছে। এসব তথাকথিত সমাজপতি সুশিক্ষিতও নন এবং তাদের বিচার নিরপেক্ষও হয় না। বিচার সম্পর্কে তারা কিছু জানেও না। সমাজের দুর্বল শ্রেণী ও নারীরা এদের নির্যাতনের প্রধান শিকার হয়ে থাকে। এসব সমাজপতি সাধারণত সবলদের পক্ষে।

বাংলাদেশের আইনে এসব বিচারের কোনো বৈধতা নেই। ভবিষ্যতে এসব বিচারের বৈধতা দেয়াও সঙ্গত হবে না, বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে। কারণ বাংলাদেশে গ্রাম-গঞ্জে অশিক্ষা-কুশিক্ষা ব্যাপক। কুসংস্কারও বেশি। নারী বিদ্বেষ ও নারীকে নিম্নশ্রেণীর মনে করার মনোভাবও ব্যাপক। আমরা জানি যে, কোনো কোনো দেশে নানা ধরনের গ্রাম্য বিচারের প্রচলন আছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে এ ধরনের বিচারের ব্যবস্থা করার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

এসব অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ করতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব বিচারে অনেক সময়ই গ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বররা শরিক হয়ে থাকে। যেমন সেলিনা ও তার মায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বরের নির্দেশে সেলিনার মাকে নির্মমভাবে লাঠিপেটা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কঠোর সার্কুলার জারি করতে পারে– যাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেম্বররা গ্রাম্য বিচারের নামে আইন তাদের হাতে তুলে না নেন। সার্কুলারে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, কোনোভাবে আইন হাতে তুলে নিয়ে কাউকে মারপিট করা, জুতার মালা পরানো এবং এভাবে গ্রামে ঘোরানো সম্পূর্ণ অবৈধ। এরকম করলে তারা তাদের স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব হারাবেন এবং বিচারের সম্মুখীন হবেন। তাদের আরো নির্দেশ দেয়া যায় যে, তাদের স্ব-স্ব এলাকার অন্যরাও যাতে এরকম করতে না পারে তা দেখা তাদের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন বা বিধি-বিধান এজন্য সংশোধন করা যেতে পারে।

আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করি, এ ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা যেন দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমরা এও আশা করি যে, গ্রাম্য বিচারের নামে এসব অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকার উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(সম্পাদকীয় : ০৯.১০.১৯৯৯)

www.pathagar.com

পতিতাদের পুনর্বাসন

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতালয়ের পতিতাদের পুনর্বাসন নিয়ে বিগত একমাস ধরে নানা কথা হচ্ছে এবং নানা সমাধান প্রস্তাব করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ অধিবাসী তাদের শহরে এ পতিতালয় দেখতে চান না। ইতোমধ্যে স্থানীয় এমপি'র নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধিদের সভায় এটি উঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এদের পুনর্বাসন করা হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে এবং সমাজসেবা মন্ত্রণালয়েও আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। এ কথা সত্য যে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ পতিতালয় পছন্দ করে না। কেননা এটি ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মেও এর বৈধতা নেই। আইনেও এটি পুরাপুরিভাবে নিষিদ্ধ না হলেও এর বৈধতা নেই।

পতিতালয়ে থাকার কারণে বাংলাদেশে অনেক নারী ও কিশোরী অপহৃত হয় এ কথাও সত্য। নানা জরিপে এবং সংবাদপত্রের অনেক সংবাদে এ তথ্য পাওয়া যায়। পতিতালয়ে থাকার কারণেই বিশ্বব্যাপী নারী অপহরণ চক্র গড়ে উঠেছে। বিশ্বের স্বাস্থ্যের জন্যও এটা হুমকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ব্যাপারে সচেতন। সিডো– কনভেনশন অব এলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ওমেন অর্থাৎ নারী প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ দলিলেও পতিতাবৃত্তি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটি কোনো স্বীকৃত পেশা হতে পারে না। যেমন পারে না চুরি, ডাকাতি পেশার মর্যাদা পেতে। এটি মানব মর্যাদার লঙ্ঘন এবং নারীর জন্য অত্যন্ত অপমানজনক।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশ আমলের সময় অনেক থানা সদরে পর্যন্ত পতিতালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরে সেসব জনগণ উৎখাত করে দেয়। বর্তমানে কেবল কয়েকটি শহরে পতিতালয় আছে। অধিকাংশ জেলা সদরে বা বিভাগীয় সদরে পতিতালয় নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সমীচীন হবে সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে যে ক'টি পতিতালয় এখনও আছে (খুব বেশি নয়) বন্ধ করে দিয়ে পতিতাদের পুনর্বাসন করা। এ জন্য একটি জরিপ দু'তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে। পতিতালয় না থাকলে ধর্ষণ বাড়বে– এ যুক্তি খুব শক্তিশালী নয়। ইরান ও সউদি আরবে পতিতালয় নেই। কিন্তু সেখানে ধর্ষণ কম। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য পতিতা রয়েছে– সেখানে ধর্ষণও বছরে লক্ষাধিক। ধর্ষণ ও পতিতালয় থাকার মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। তবে সাময়িকভাবে ধর্ষণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সে বিষয়টি সমাজকে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহকে মনে রাখতে হবে। সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এখন হাউজিং পলিসি নেয়া যেতে পারে যাতে দীর্ঘমেয়াদে সবাই পরিবার নিয়ে থাকতে পারে। বিবাহ সহজ করা প্রয়োজন যাতে (কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দিয়ে) নৈতিক পুনর্বাসনও সম্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সুস্থতা ও শান্তি এবং এ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে।

(সম্পাদকীয় : ২২.০৭.১৯৯৯)

www.pathagar.com

সরকারি উদ্যোগে পতিতা পুনর্বাসন

দৈনিক অর্থনীতির নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতার প্রেরিত খবর থেকে জানা যায় যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় টানবাজার ও নিমতলির ১৩১ জন পতিতাকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, টানবাজার পতিতালয় উচ্ছেদের সময় সেখান থেকে ২৬৭ জন পতিতাকে কাশিমপুর ও পুবাইল আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১২৫ জনকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে তুলে দেয়া হয়। বর্তমানে ১৩৩ জনকে গার্মেন্টসে কাজ দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। আমরা সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। পরিস্থিতির অনভিপ্রেত শিকার হওয়া নারীদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন করার এটাই সঠিক পথ।

এই পতিতা নারীদের ব্যাপারে শিল্পপতিদের আর্থিক সহায়তা তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। যে সকল শিল্প মালিক এসব নারীর পুনর্বাসনে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সাহায্য করছেন তারা জাতির ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকারী। আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, সরকারের এ পুনর্বাসন প্রকল্পে আমাদের দেশের শিল্পপতিগণ সাহায্য করবেন। বিশেষ করে তারা আমাদের নতুন শিল্প ইউনিটে এই অসহায় নারীদের কাজ দিতে পারেন।

যে সকল নারী টানবাজার থেকে পুনর্বাসনের সরকারি উদ্যোগকে গ্রহণ না করে পালিয়ে গেছে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ চেষ্টা করতে পারে। এ জন্য মন্ত্রণালয় পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারে। এ ব্যাপারে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাহলে এসকল নারী অন্যস্থানে পতিতা পেশায় ফিরে যাবে না।

এ ব্যাপারে কিছু নারীকে যে আত্মীয়-স্বজনরা নিয়ে গেছেন তাদের প্রশংসা করছি। হতে পারে কিছু ক্ষেত্রে দালালরা এসব নারীকে নিয়ে গেছে, সেটা অনভিপ্রেত। এ ব্যাপারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সতর্কতা প্রয়োজন। তাদের কেসসমূহে নজরদারি প্রয়োজন। আশা করি, সমাজকল্যাণ বিভাগ তা করবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনরা সত্যি সত্যি তাদের স্বজনদের নিয়ে গেছেন। এটা তাদের প্রশংসনীয় কাজ। আমাদের সমাজ যে ক্রমশ মানসিক দিক থেকে উন্নত হচ্ছে, এটা তার প্রমাণ। পূর্বে এটা আরো কঠিন ছিল। আমরা মনে করি, জনগণকে যদি দেশের সামাজিক নেতৃত্বের মাধ্যমে বোঝানো যায় তাহলে এসকল নারীকে সমাজে এবং তাদের নিজস্ব পরিবেশে পুনর্বাসন করা সহজ হবে। এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও দেশের ইমামরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সমস্যার সঠিক সমাধানে সামাজিক গবেষণারও প্রয়োজন। এসকল নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে এনজিওরাও ভূমিকা রাখতে পারে।

(সম্পাদকীয় : ০৫.১০.১৯৯৯)

www.pathagar.com

রাশিদার নির্মম হত্যা

পত্রপত্রিকায় এ খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, ধর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে ৪/৫ জন সন্ত্রাসী রাশিদা নামে একজন স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে তার গোপন অঙ্গ ও ঘাড়ে এসিড ঢেলে চলে যায়। এর ২৪ ঘন্টা পর সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে। সে হাসপাতালের বিছানার পাশে রেখে গেছে দুই ছোট সন্তান, মাসুদ (৬) ও শিল্পী (৪)। আরো জানা যায় যে, রাশিদা লালবাগ থানাধীন পার্ক বস্তিতে বাস করতো এবং ইট ভেঙে জীবন চালাতো। এক বছর আগে তার স্বামী শামসু মিঞা এদের ফেলে চলে যায়। বস্তিতে যখন সে সন্তান দুটিসহ ঘুমিয়ে ছিল তখন সন্ত্রাসী খালেদের নেতৃত্বে ৪/৫ জন বস্তিতে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে এসিডে তাকে দগ্ধ করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

এ ধরনের নৃশংসতার ঘটনা অহরহই ঘটছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এসবের প্রতিবিধান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেক বস্তি এলাকা অপরাধের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। প্রায় বস্তিই কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও অপরাধী নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে সকল বস্তিবাসীরই জীবন, তাদের সামান্য সম্পদ এবং সম্মান বিপদের সম্মুখীন। নারীদের অবস্থা আরো অসহায়। অনেক সময় স্বামী ও পিতার সামনে থেকে অপরাধীরা তাদের ছিনিয়ে নিতে এবং অসৎ কাজে লিপ্ত করতে বাধ্য করে। আর স্বামী-পুত্র বা পিতা না থাকলে নারীদের অসহায়তা চরমে পৌঁছে। তাদের সম্মান রক্ষা তখন অত্যন্ত কঠিন হয়। তারা অপরাধীদের লোলুপ দৃষ্টির শিকারে পরিণত হয়।

এ পরিস্থিতি চলতে দেয়া যায় না। এর জন্য কিছু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বস্তিসমূহের একটি জরিপ সরকার করেছেন এবং এক্ষেত্রে সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে। এর মধ্যে রয়েছে এসব বস্তি উৎখাত এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি এজন্য মুলতবি থাকতে পারে না। সরকারকে এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রত্যেক বস্তিতে বস্তির লোকদের সমন্বয়েই প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করতে পারেন। যদি এ ধরনের কমিটি থেকে থাকে তাহলে এগুলোকে পুরাপুরিভাবে প্রশিক্ষিত ও আগ্রহী করতে হবে, যাতে তারা তাদের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করেন। এ ব্যাপারটিকে ঢাকার পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে। দায়সারা ভাবে এ কাজটি করলে চলবে না।

ঢাকার আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের একটি বড় অংশ বস্তিকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে বস্তিগুলোর দিকে বিশেষ নজর রাখা এবং এ ব্যাপারে উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদি এ কাজটি ভালো করে করতে পারেন তাহলে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে তাদের কাজের অগ্রগতি হবে বলে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আমরা আশা করি এ ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আমরা রাশিদার ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।

(সম্পাদকীয় : ১৫.০৭.১৯৯৯)

www.pathagar.com

ঝিনাইদহে মহিলাদের ভোটাধিকার

ঝিনাইদহের ১২টি গ্রামের মহিলারা ভোট দিতে পারেনি। একদল ব্যক্তির ফতোয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে এরকম আরো কয়েকটি স্থান রয়েছে যেখানে মহিলারা অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক আর কোনো খবর হতে পারে না।

বিষয়টির প্রতি সব রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন এবং আলেমদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমি বাংলাদেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলকে ঝিনাইদহের সুরাট ইউনিয়নের ১২টি গ্রামের মহিলারা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এর পেছনে ইসলামী বিধানের ভুল ব্যাখ্যা থাকতে পারে, অথচ বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ আলেমের মতে এবং যেসব দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র রয়েছে সেসব দেশের শাসনতন্ত্রে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত। আমি জ্যেষ্ঠ (senior) আলেমদের এবং ইসলামী দলসমূহকে এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ করছি।

(দৈনিক যুগকণ্ঠ : ১৬.১২.১৯৯৮)

www.pathagar.com

শবমেহের

শবমেহের একটি ছন্দময় অপূর্ব সুন্দর নাম। গ্রাম বাংলার এক কিশোরী যে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন দেয়। শত অত্যাচারের মুখেও সে এই বৃত্তির প্রতিষ্ঠানের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। তাই শবমেহের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক প্রতীক।

শবমেহেরের মায়ের মুখে জানা যায়, সে নরসিংদী জেলার মাধবদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। দেশ স্বাধীনের কয়েক মাস পর শবমেহেরের পিতা মারা যায়। দরিদ্র ঘরের সন্তান শবমেহেরকে তখন তার মা চেনারদি গ্রামে সেলিম খাঁর বাড়ীতে কাজ দেয়। সেখানে জরিনা নামে এক মেয়ের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। এই জরিনার খালুর চোখে পড়ে যায় শবমেহের। বেড়াবার নাম করে জরিনা শবমেহেরকে খালুর বাড়ি নিয়ে যায়। এই জরিনা ও তার খালুই শবমেহেরকে টানবাজার পতিতালয়ে রহিমা সর্দারণীর নিকট বিক্রি করে দেয়। (খিলগাঁও ইসলামী পাঠাগার প্রকাশিত 'শবমেহের' স্মরণিকা হতে)।

শবমেহের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সে খদ্দেরদের ঘর থেকে বের করে দেয়। এরপর শুরু হয় তার উপর অকথ্য অত্যাচার। শবমেহেরের মায়ের বক্তব্যে জানা যায় যে, রহিমা রড দিয়ে শবমেহেরকে বুকে, পেটে প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেলে। জ্ঞান ফেরার পর পুনরায় কারেন্টের ছেক দেয়। তারপর মুগুর দিয়ে তাকে পিটায়। শবমেহের অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। সে মারা গেছে মনে করে তাকে গর্তে ফেলে দিতে পাঠায় রহিমা। পথে তার একটু জ্ঞান ফিরে আসলে একটি মেয়েকে সে ধর্মের বোন ডেকে তাকে বাঁচাতে অনুরোধ করে। সে মেয়ে তখন তাকে রেল লাইনের ধারে এক লীচু গাছের নীচে রেখে দেয়। অপর এক লোক তাকে ট্রেনে তুলে নিয়ে আসে। অন্য একজন তাকে কমলাপুর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেখে যায়। হাসপাতালের বারান্দায় সে একদিন ছিল। তারপর এক ওয়ার্ড বয় তার অবস্থা দেখে একজন ডাক্তারকে বলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় (দ্রষ্টব্য : ঐ)।

কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পরে সে ৯ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে মারা যায়। তখন তার বয়স ১৪ বছর।

নারায়ণগঞ্জের সেশনে এ কেসের বিচার হয়েছিল। বিচারের রায় থেকে দেখা যায় যে, পোস্টমর্টেমে তার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার বাম উরুতে ১৬" x ৬", তার ডান উরুতে ১০" x ৩", অন্যান্য স্থানে ৪" x ৩", ২" x ১" এবং ২.৫" x ১" আঘাত পাওয়া যায়। এছাড়াও তার মাথা, ফুসফুস, যকৃত, কিডনী ও অন্যান্য সব স্থানে আঘাতের ফলে পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি জমেছিল (শবমেহেরের মামলার আদালতের রায় হতে)।

www.pathagar.com

এতসব অত্যাচার সত্ত্বেও শবমেহের নতি স্বীকার করেনি এবং পতিতাবৃত্তিকে গ্রহণ করেনি। তার বিদ্রোহের মাধ্যমে সে নারীত্বকে সম্মানিত করেছে।

৯ই এপ্রিল তাই শবমেহের দিবস পালিত হয়। শবমেহেরের মতো হাজারো মেয়েকে বাঁচাতে হলে তাই পতিতাবৃত্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে বন্ধ করতে হবে। আমরা সবাই জানি যে প্রতি বছর হাজার হাজার মেয়েকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। পতিতাবৃত্তি বন্ধ না করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অনেকে বলে থাকে, পতিতালয় না থাকলে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে—একথা যথাযথ নয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক অনুমোদিত ও অননুমোদিত পতিতালয় থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রতি বছর লাখ লাখ মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে। ধর্ষণের মূল কারণ অশ্লীল সামগ্রীর বিস্তার। অবশ্য সব সমাজেই বদমাশদের দ্বারা কিছু ধর্ষণ হতে পারে। কিছু ধর্ষণের ভয়ে পতিতালয় খোলা রেখে লাখ লাখ মেয়ের সর্বনাশের পথ খোলা রাখা যায় না। পতিতালয় না থাকলে পতিতারা ছড়িয়ে যাবে এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। পতিতালয় থাকলেও কিছু পতিতা ছড়িয়ে থাকে। তাদেরকে খুঁজে বের করে পুনর্বাসিত করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তি দিতে হবে।

www.pathagar.com

এ্যাডর্ন প্রকাশনা

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত
আত্মজীবনী / আবু রুশদ
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
নূর মোহাম্মদ রফিক সম্পাদিত
পথে যা পেয়েছি / মোঃ আনিসুর রহমান
দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা / রাশেদ খান মেনন
বরণীয় জনের স্মরণীয় বাণী / লুৎফর রহমান সরকার
রাজনীতি ও সংস্কৃতি : সম্ভাবনার নবদিগন্ত / আবুল কাসেম ফজলুল হক
নজরুল : বৈচিত্র্যে বৈভবে / খালেদা হানুম
তাওফীক আল হাকীমের নাটক / আহসান সাইয়েদ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক
মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক
বাংলাদেশের ছোটগল্প / খালেদা হানুম
মানবপ্রেমিক জোশেফ রেসিঙ্গকি / জীবনানন্দ মহাপাত্র
এক তোতা পাখির গল্প / মাহবুবুল হাসান
জীবনের পায়ে পায়ে / আফরোজা অদিতি
আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে / ময়ুখ চৌধুরী
বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি
ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া
The Struggling Democracy of Bangladesh
Amanullah Kabir
একুশে ও স্বাধীনতা, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ বাস্তবতা
মোঃ আনিসুর রহমান
প্যারিসের নীলরুটি / ময়ুখ চৌধুরী
নান্দনিক অশ্রু / সিরাজুন নাহার সাথী
প্রেম / আবদুল মান্নান সৈয়দ
পিনাকীর মাটির কাছে যাওয়া / মুস্তফা নকিব
নির্বাচিত কবিতা / সুহিতা সুলতানা
গৃহবধু পিঞ্জরের পাখি / আহসান সাইয়েদ
আবুল কাসেম ফজলুল হক সাক্ষাৎকারে চেতনালোক
সাহসী মানুষের গল্প / আতা সরকার

এ্যাডর্ন পাবলিকেশন

২৯ সেগুন বাগিচা (পুরাতন ১৪১) ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৩০১৯, ফ্যাক্স : [illegible]
চট্টগ্রাম অফিস : আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : [illegible]